অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
নবীগঞ্জের দৈত্য
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
নবীগঞ্জের দৈত্য
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবীগঞ্জের দৈত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: সুব্রত চৌধুরী

রাস্বা
শ্রীমান দিব্যদ্যুতি রায় কল্যাণীয়েষু

শরৎকালের সকাল। চারদিকে বেশ নরম রোদ। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে। প্রজাপতি উড়ছে। গোরুর হাম্বা শোনা যাচ্ছে। হরিহরের পাঠশালায় ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। মহিমের পিসি উঠোনের কোণে ভাত ছড়িয়ে কাকদের ডাকাডাকি করছে। পাঁচু চোর সারারাত চুরির চেষ্টা করে বাড়ি ফিরে পান্তাভাত খেতে বসেছে। রায়বাবু রুপোবাঁধানো লাঠি হাতে প্রাতভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে কুকুর। হাড়কেপ্পন হাবু বিশ্বাস খালের জলে গামছা দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। নিমাই আর নিতাই দুই বন্ধু পুকুরের ধারে বসে দাঁতন করতে করতে সুখ-দুঃখের গল্প করছে। শিকারি বাসব দত্ত তার দাওয়ায় বসে পুরনো বন্দুকটায় তেল লাগাচ্ছে। জাদুকর নয়ন বোস বাইরের ঘরে বসে পামিং-পাসিং প্র্যাকটিস করছে। হরেন চৌধুরী ওস্তাদি গানের কালোয়াতি করে যাচ্ছে। আর বটতলায় হলধরের কাছে বসে ন্যাড়া হচ্ছে পুটে সর্দার ।

পুটে বলল, “দিনকাল কী পড়ল রে হলধর। আলুর কেজি আশি পয়সা! চাল আড়াই টাকা কিলো!”

হলধর পুটের মাথা কামাতে-কামাতে বলল, “আমার ছোট ছেলেটার কথা বলছ তো! না, তার এখনও কোনও হিল্লে হল না।”

“তই তো বলছি রে । যুদ্ধের সময় আকাল পড়েছিল, আর এই এইবারই দেখছি।”

“তা যা বলেছ। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কি আর মা-বাপের কথা শুনে চলে? আমার মেজো শালার মস্ত পাটের ব্যবসা, কতবার বলি, ওরে একবার মামার কাছে যা। না, তার নাকি সম্মানে লাগে।”

"একেবারে নিয্যস কথাটা বলেছিস কিন্তু। রামভজন দুধওলার দুধে আর সর পড়ে না। ঘি, তেল, কোনটা খাটি আছে বল?”

কথাটা হল, পুটে সর্দরের বয়স নব্বই ছাড়িয়েছে, হলধরের পচাঁশি, দুজনেই শক্তসমর্থ আছে বটে, কিন্তু কেউই কানে শোনে না। এ একরকম বলে, ও আর-একরকম শোনে। তবু দুজনেই সমানে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে আসছে। পুঁটে সর্দার প্রতি মাসে একবার করে ন্যাড়া হয়, আর হস্তায় দুদিন দাড়ি কাটে। সবই হলধরের কাছে।

প্রতি মাসে ন্যাড়া হওয়ার পেছনে একটা বৃত্তান্ত আছে। পুঁটে সদার যৌবনকালে মস্ত ডাকাত ছিল! এই নবীগঞ্জের পশ্চিমে নদীর ওধারে যে পেল্লায় জঙ্গল ছিল, সেখানেই ছিল তার আড্ডা। আশপাশে গাঁয়ে-গঞ্জে তার অত্যাচারে কেউ আর টাকাপয়সা ঘরে রাখতে পারত না। ডাকসাইটে সাহেব-দারোগা অবধি তাকে কখনও ধরতে পারেনি। তবে নবীগঞ্জের রাজা ক্ষেত্রমোহন চৌধুরীকে সে একটু এড়িয়ে চলত। ক্ষেত্র চৌধুরীর একখানা ছোটখাটো ফৌজ ছিল। তাদের বিক্রমও ছিল খুব। সাহেব-দারোগা হিলটন অবশেষে একদিন ক্ষেত্রমোহনের দ্বারস্থ হয়ে আরজি জানাল : ডাকাত পুঁটে সর্দরকে টিট করতে সাহায্য চাই। ক্ষেত্রমোহনও পুঁটের ওপর খুশি ছিলেন না । তাঁর প্রজাদের অনেকেই পুঁটের

বিরুদ্ধে নালিশ করেছে তাঁর কাছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে একজন দিশি রাজা তো নিজের দায়িত্বে এসব করতে পারেন না। হিলটনের আরজিতে ক্ষেত্রমোহন রাজি হয়ে গেলেন। ক্ষেত্রমোহনের অত্যন্ত চালাক-চতুর একটি চর ছিল। তার নাম বিশু। সেই বিশুকে পুঁটে সর্দারের গতিবিধির খবর আনতে পাঠালেন ক্ষেত্রমোহন। বিশু দুদিন বাদে খবর এনে দিল, সামনে অমাবস্যায় গোবিন্দপুরে মদন সরখেলের বাড়িতে ডাকাতি হবে।

অমাবস্যার সেই রাতে গোবিন্দপুরে আর পৌঁছতে হয়নি পুঁটেকে। গোবিন্দপুরের লাগোয়া ময়নার মাঠে ক্ষেত্রমোহনের ফৌজ ঘিরে ফেলল তাদের। একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। পুঁটেকে ধরে আনা হল নবীগঞ্জে, ক্ষেত্রমোহনের দরবারে। পুঁটে সদর হাতজোড় করে বলল, "রাজামশাই, আমার বাপ আর পিতামহ আপনার বাপ আর পিতামহের ফৌজে ছিল। আমি কুলাঙ্গার, ফৌজে না এসে বেশি লাভের আশায় ডাকাতিতে নাম লেখাই। দোহাই মহারাজ, সাহেবদের হাতে দেবেন না, ওদের ওপর আমার বড় রাগ। যা শাস্তি হয় আপনিই দিন, গর্দান যায় তাও ভাল।"

ক্ষেত্রমোহন বিচক্ষণ লোক। মৃদু হাসলেন। সবাই জানে, ক্ষেত্রমোহনও ইংরেজদের মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁর হাতের ইশারায় সেপাইরা পুঁটেকে হাজতে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে এক নরসুন্দর এসে পুঁটের মাথাটা ন্যাড়া করে দিল। উড়িয়ে দিল পেল্লায় গোঁফজোড়াও। এর চেয়ে বেশি সাজা ক্ষেত্রমোহন দেননি।

ওদিকে হিলটন যখন খবর পেয়ে ধরতে এল তখন ক্ষেত্রমোহন সাহেবকে বললেন, "পুঁটে সর্দার আর ডাকাতি করবে না, তার হয়ে আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু তাকে আমার হেফাজতেই থাকতে দাও।"

হিলটন গাঁইগুঁই করল। পুঁটেকে ধরে দিলে তার কিছু বকশিশ পাওনা হয়। ক্ষেত্রমোহন বকশিশটা নিজের তহবিল থেকেই দিয়ে সাহেবকে বিদায় করলেন। পুঁটে আর তার দলবলকে ক্ষেত্রমোহন ফৌজে ভর্তি করে নিলেন।

পুঁটে সেই থেকে প্রতি মাসে ন্যাড়া হয়ে আসছে। সেই ক্ষেত্রমোহন বহুদিন গত হয়েছেন। তস্য পুত্র পূর্ণচন্দ্রও আর নেই। তবে ক্ষেত্রমোহনের নাতি আজও আছে। তার নাম বীরচন্দ্র। নামে বীর হলেও বীরচন্দ্র মোটেই বীর নয়। সাঙ্ঘাতিক লাজুক প্রকৃতির বীরচন্দ্র রাজবাড়ির ভেতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে। কারও সঙ্গে দেখা করে না। একা-একা বীরচন্দ্র যে প্রাসাদের মধ্যে কী করে তা কেউ জানে না।

দরোয়ান, বরকন্দাজ ওসব কিছু নেই। থাকার মধ্যে এক বৃদ্ধ চাকর বনমালী আছে। আর আছে ততোধিক বৃদ্ধ এক রাঁধুনি। একজন সরকারমশাইও আছেন বটে, কিন্তু আদায়-উশুল নেই বলে তিনি বসে-বসে মাছি তাড়ান আর মাঝেমধ্যে বাজারহাট করে দেন।

শরৎকালের এই সুন্দর সকালে রাজবাড়ির সরকারমশাই ভুজঙ্গ হালদার বাজারে চলেছেন। এক হাতে ছাতা, আর-এক হাতে চটের থলি। ভারী অন্যমনস্ক মানুষ। ছাতাটা হাতে ঝুলছে, থলিটা মাথায়।

রাজবাড়ির ভাঙা ফটকের সামনে দুজনের দেখা হল। ভুজঙ্গবাবু আর পুঁটে সর্দার।

ভুজঙ্গবাবু ভ্রূ একটু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, "এই যে বৃন্দাবনদাদা, চললে কোথায়?"

পুঁটে সর্দার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে,"না হে না, বাজারে যাব কেন? আমার বাজার কোন সকালে হয়ে গেছে।তা রাজবাড়ির খবরটবর কী, বলো!"

ভুজঙ্গবাবু হাত উলটে হতাশ গলায় বলেন, "খবর আর কি।

তা ওই গয়ংগচ্ছ করে চলছে। আদায়-উশুল উঠে গেছে, ঘটিবাটি বেচে চলছে কোনওরকমে।"

পুঁটে সদর চোখ বড়-বড় করে বলল, "বলো কী! রাজবাড়িতে সাপ ঢুকেছিল? কতবড় সাপ?"

ভুজঙ্গবাবু বললেন, "তা সাপখোপেরও অভাব নেই। মেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছুঁচো, ইঁদুর, বাদুড়, তক্ষক সবই পাবে। রাজবাড়িতে এখন ওদেরই বাস কিনা। দুঃখের কথা কী বলব রে ভাই জনার্দন, আজকাল চোর ছ্যাঁচড়রা অবধি লজ্জায়-ঘেন্নায় রাজবাড়িতে ঢোকে না।"

"তই নাকি? তা হলে তো খুব ভয়ের কথা হল। ভূত-প্রেতের উপদ্রব তো মোটেই ভাল কথা নয়। তা তুমি বাজারের থলিটা মাথায় চাপিয়েছ কেন গো? মাথাটা আবার গরম হল নাকি?"

জিভ কেটে ভুজঙ্গবাবু তাড়াতাড়ি থলি বুলিয়ে ছাতা খুলে মাথায় ধরে বললেন, "যাই, কচু-ঘেঁচু যা পাই নিয়ে আসি। রাজামশাই চাট্টি খাবেন।"

"না, না, আমার বাগানে এখনও লাউ ফলেনি। তবে কুমড়ো কিছু হয়েছে। ফলন মোটেই ভাল নয়। তা আসি গিয়ে। রাজামশাইকে আমার পেন্নাম জানিয়ো।"

ভুজঙ্গবাবু বললেন, "হুঁ, রাজামশাই! রাজা হতে মুরোদ লাগে। বুঝলে আজিজুলভায়া, রাজা শুধু মুখের কথায় হয় না।"

এই বলে ভুজঙ্গবাবু হনহন করে চলে গেলেন। পুঁটে সর্দার নিজের ন্যাড়া মাথায় খুশিমনে হাত বোলাতে-বোলাতে নবীগঞ্জের খবরাখবর নিতে চলল। আজ মনটা খুশিতে একেবারে টাকডুমাডুম। যেদিন ন্যাড়া হয় সেদিনটায় ভারী আনন্দ হয় তার।

নবীগঞ্জের সবচেয়ে দুঃখী লোক হলেন দুঃখহরণ রায়। ছোটখাটো, দুর্বল, ভিতু এই মানুষটি একসময়ে নবীগঞ্জের স্কুলে মাস্টারি করতেন । কিন্তু ছেলেরা তাঁর কথা মোটেই শুনত না, ক্লাসে ভীষণ গণ্ডগোল হত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডসার প্রতাপচন্দ্র মার্কণ্ড অবশেষে দুঃখবাবুকে ডেকে বললেন, "এভাবে তো চলতে

পারে না। আপনি বরং কাল থেকে আর ক্লাস নেবেন না, কেরানিবাবুকে সাহায্য করবেন। ওটাই আপনার চাকরি।”

দুঃখবাবু এ-কথায় খুব দুঃখ পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। তাঁর দজ্জাল স্ত্রী চণ্ডিকা এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দুঃখবাবুকে খুব কড়া-কড়া কথা শোনাতে লাগলেন দুবেলা। দুঃখবাবু অগত্যা বাড়ির বাইরের দিকে একখানা খোড়ো ঘর তুলে আলাদাভাবে বাস করতে লাগলেন। তাঁর দুটো ছেলে রাম আর লক্ষ্মণ নবীগঞ্জের কুখ্যাত ডানপিটে দুষ্ট ছেলে। তাদের অত্যাচারে লোকে জর্জরিত। একে মারছে, তাকে ধরছে, ফল-পাকুড় চুরি করছে, গাছ বাইছে, যখন-তখন যাকে-তাকে দূর থেকে টিল মেরে পালাচ্ছে। তাদের সামলানোর সাধ্যও দুঃখবাবুর নেই। কিন্তু লোকে এসে তাঁকেই অপমান করে যায়। দুঃখবাবু মাথা নিচু করে অপমান নীরবে হজম করেন। হতদরিদ্র, মুখচোরা দুঃখবাবুকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। একা-একা থাকেন। একা থাকতে-থাকতে নিজের মনেই নানা কথা বলেন। কখনও আপনমনে হাসেন। কখনও মনখারাপ করে বেজার মুখে বসে থাকেন। মাঝে-মাঝে খুব হতাশ হয়ে বলেন, “হায় রে, আমার কি কেউ নেই?”

একদিন রাতের বেলা চোর এল। ঘরে খুটখাট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে উঠে বসলেন দুঃখবাবু। কাঁপা গলায় বললেন, “কে হে বাপু? আমি বড় ভিতু মানুষ।”

চোরটি লাইনে নতুন। পুরনো চোর হলে কখনও দুঃখবাবুর ঘরে ঢুকত না। আর ধরা পড়লে ভয়ও পেত না।

কিন্তু আনাড়ি চোরটি ভয় পেল এবং ভাঙা জানলা দিয়ে পালাতে গিয়ে বাখারির খোঁচা খেয়ে বাপ রে বলে বুক চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখেন জানলার ভাঙা বাখারির খোঁচায় চোরটার বুকে বেশ ক্ষত হয়েছে।

দুঃখবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, “পালানোর কোনও দরকারই ছিল না তোমার। আমি কি তোমাকে মারতুম রে ভাই? আমার গায়ে জোরই নেই। দেখছ না আমার কেমন রোগা-রোগা হাত-পা? কস্মিনকালে কেউ আমাকে ভয় খায়নি। দাঁড়াও আমার কাছে একটা মলম আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি। তারপর একটু জল-বাতাসা খাও, জিরোও।”

চোরটার ক্ষতে মলম লাগানো হল। খুবই লজ্জার সঙ্গে জল-বাতাসাও সে খেল। কিন্তু খুব গুম হয়ে রইল। নিজের আনাড়িপনার জন্যও বোধ হয় লজ্জা হয়েছে। বয়সটাও বেশি নয়। দুঃখবাবুর চোরটাকে বেশ ভালই লাগল। লোকটার সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে ইচ্ছে করছিল। দুঃখের বিষয়, দুঃখবাবুর সঙ্গে কেউই বিশেষ কথাটথা বলতে চায় না। অথচ দুঃখবাবুর খুব ইচ্ছে করে একজন বেশ সহৃদয় লোককে বসে-বসে নিজের দুঃখের কথা শোনান।

দুঃখবাবু গলাখাকারি দিয়ে আলাপ শুরু করলেন, “ওহে বাপু, অমন বেজার হয়ে থেকো না। আমি যে লোকটা খারাপ নই তা তো টের পেলে। তোমার ওপর

আমার কোনও রাগও নেই। তা তোমার বাড়ি কোথায়? নাম কী?”

চোরটা একটু নড়েচড়ে বসে বলল, “ওসব বলা বারণ আছে।”

“কেন, বারণ কেন গো? আমি কি আর পুলিশের কাছে বলতে যাচ্ছি?”

“বললেই বা আটকাচ্ছে কে?”

দুঃখবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন, “পুলিশও কি আর আমার কথা কানে তুলবে? আমাকে কেউ পোঁছে না, বুঝলে? কেউ পোঁছে না, অথচ আমার পেটে কত কথা জমে আছে। এসো, একটু গল্প করা যাক।”

চোরটা মাথা নেড়ে বলল, “না মশাই, আমার কাজ আছে। আপনার এখানে তো কিছু হল না। খালি হাতে ফিরলে কি আমাদের চলে?”

চোরটা ফের ভাঙা জানলা দিয়েই পালিয়ে গেল। দুঃখবাবু বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন, “হায় রে, আমার কি কেউ নেই?”

না, দুঃখবাবুর সত্যিই কেউ নেই। তাই দুঃখবাবু মনের দুঃখে মানুষ ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা নেড়ি কুকুর জুটল। তার নাম দিলেন ভুলু। তা ভুলু দুঃখবাবুর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিল। প্রায়ই এসে দরজার কাছে বসে, লেজ নাড়ে। দুঃখবাবু আদর করে বলেন, “ভুলু নাকি রে? ইস। বড্ড রোগ হয়ে গেছিস যে ভাই। সারা দুপুর টোঁ-টোঁ করে বেড়াস, অসুখবিসুখ করে ফেলবে যে।”

এইভাবে কথা চলতে থাকে। কিন্তু ভুলুর শুধু দুঃখবাবুকে নিয়ে চলে না। কারণ দুঃখবাবুর খাওয়াদাওয়া বড্ড সাদামাঠা। ডাল আর ভাত। ভুলু সুতরাং মাছ-মাংসওলা বাড়িতেও গিয়ে হানা দেয়।

ভুলু ছাড়া আরও দু-একজন বন্ধু জুটে গেল দুঃখবাবুর। ঘরের মধ্যে একজোড়া চড়াইপাখি বাসা করেছে। তাদের আবার ছানাপোনাও হয়েছে। দুঃখবাবু চড়াইপাখি দুটোর নাম দিয়েছেন হরিপদ আর মালতী। কিন্তু হরিপদ আর মালতী সারাদিন ভারী ব্যস্ত। চুড়ুক করে উড়ে যাচ্ছে, ফুড়ুত করে ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে, আসছে। তার ফাঁকে-ফাঁকে অবশ্য দুঃখবাবু তাদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন, “হরিপদ যে, শরীর ভাল তো! ছেলেপুলেরা সব কেমন আছে রে? বলি ও মালতী, কয়েক দানা মুড়ি বা চিড়ে খাবি? মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে!”

কেঁদো চেহারার একটা ছুঁচো প্রায়ই দুঃখবাবুর ঘরে উৎপাত করে। দুঃখবাবু তার নাম দিয়েছেন হলধর। তাকে বিস্তর ডাকাডাকি করেন দুঃখবাবু, “বলি ও হলধর, শুনছিস? বেশ আছিস ভাইটি। মাটির তলায় ডুব দিয়ে থাকিস, দুনিয়ার কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। আর এই আমার অবস্থা দেখ। মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বটে, কিন্তু মানুষের মতো কি বেঁচে আছি?”

বোলতা, ফড়িং, ব্যাঙ ইত্যাদির সঙ্গেও কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন দুঃখবাবু। তবে বুঝতে পারেন, এরাও সব ভারী ব্যস্ত মানুষ। সারাদিন বিষয়কর্মে ঘুরে

বেড়ায়, রাতে একটু জিরোয়। দু দণ্ড বসে কথা শোনার সময় কারও নেই। তিনি যে একা সেই একা।

একদিন মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে তিনি বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বলে উঠলেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই?"

বলেই তিনি হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠলেন। ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিল কে? একেবারে স্পষ্ট সুড়সুড়ি। ভয় পেলেও ভাবলেন সেই চোরটা হয়তো ভাব করতে এসেছে। তাই কাঁপা গলায় বললেন, "চোরভায়া নাকি? অনেকদিন পর এলে।"

না, চোর নয়। বাতি জ্বেলে চারদিক ভাল করে দেখলেন তিনি। কেউ নেই। মনের ভুলই হবে হয়তো! আবার বাতি কমিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই ফের ঘাড়ে কে যেন সুড়সুড়ি দিল। এবার আরও স্পষ্ট। সাপখোপ বা বিছেটিছে নয় তো? তাড়াতাড়ি উঠে ভাল করে বিছানা-টিছানা হটিকে-মাটকে দেখলেন। কোথাও কিছু নেই। আবার শুলেন। চোখ বুজে মটকা মেরে রইলেন, ঘুম এল না। আচমকা মাথার চুলে কে যেন পটাং করে একটা টান মারল। "বাপ রে" বলে উঠে বসলেন তিনি। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। ভূত নাকি? "রাম, রাম, রাম, রাম" বলতে-বলতে ভয়ে কেঁদেই ফেলছিলেন তিনি। হঠাৎ মনে হল, আমার তো কেউ নেই। তা ভূত-বাবাজির সঙ্গেই না হয় একটু বন্ধুত্ব হল!

গলাখাকারি দিয়ে একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় দুঃখবাবু বললেন, "ভূত-বাবাজি নাকি? আস্তাঞ্জে হোক, বস্তাঞ্জে হোক। এই অভাজনের কাছে যে আপনি আগমন করেছেন সেটা এক মস্ত সৌভাগ্যই আমার। দয়া করে কোনও বিকট চেহারা নিয়ে দেখা দেবেন না। আমি বড় ভিতু মানুষ।"

না, ভূত দেখা দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখবাবু শুয়ে পড়লেন। রাতে আর কিছু হল না।

কিন্তু পরদিন হল। দুঃখবাবু শুয়ে আছেন। ঘুমটাও এসে গেছে। এমন সময়, না, সুড়সুড়ি নয়, কে যেন পেটে বেশ একটা রাম-কাতুকুতু দিল। দুঃখবাবুর বড় কাতুকুতুর ধাত। তিনি কাতুকুতু খেয়ে হেসে ফেললেন। তারপর "বাপ রে" বলে উঠে বসলেন। টের পেলেন ভয়ের চোটে তাঁর মাথার চুল খাড়া-খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ভূত নাকি? ঘরে তো কেউ নেই! বসে-বসে দুঃখবাবু বুকের ধড়াস-ধড়াস শব্দ শুনলেন কিছুক্ষণ। এসব হচ্ছেটা কী? এসব হচ্ছে কেন? তিন গেলাস জল খেয়েও তাঁর গলাটা শুকনোই রইল। অনেকবার রামনাম করলেন।

ফের কাতুকুতুটা হল ভোরের দিকে । দুঃখবাবু প্রথমটা খিলখিল করে হেসে উঠেই ভয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। আর ঘুম হল না।

কাতুকুতু বা সুড়সুড়ির ওপর দিয়ে মিটে গেলে কথা ছিল না। কিন্তু দিন-দুই পরেই দিনেদুপুরে যখন বাজার থেকে ফিরছিলেন তখন বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কে যেন পেছন থেকে পটাং করে একটা গাঁটা দিল। প্রথমটায় ভেবেছিলেন, কোনও দুষ্ট ছেলে ঢিল মেরেছে। কিন্তু ঢিল মারলে ঢিলটা মাটিতে

পড়ার শব্দ হবে। হয়নি। টিল খেতে কিরকম লাগে তা দুঃখবাবু ভালই জানেন। অনেকবার টিল খেয়েছেন।

সুড়সুড়ি আর কাতুকুতুর সঙ্গে গাঁটাটাও সুতরাং যোগ হল। আগে রাতে হত, আজকাল দিনমানেও হচ্ছে। কখনও গাঁটা, কখনও সুড়সুড়ি, কখনও কাতুকুতু। কে যে এসব করছে, তা বুঝতে পারছেন না দুঃখবাবু। ভূতই হবে। তবে আজকাল আর তেমন এক লাগছে না নিজেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে যদি হঠাৎ বলে বসেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই।" সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় খটাং করে গাট্টা খেতে হয়।

আর কেউ না হোক, মাঝে-মাঝে পুঁটে সর্দার এসে তাঁর খোঁজখবর নেয়।

আজও পুঁটে ন্যাড়া হওয়ার আনন্দে ডগমগ হয়ে দুঃখবাবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হা□ক মারল,"কই হে মাস্টার! আছো টাছো কেমন?"

দুঃখবাবু বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে এসে বললেন, "আছি কই দাদা! সেই কাতুকুতু সমানে চলছে। গট্টাও খেতে হচ্ছে প্রায়ই।"

পুঁটে সর্দার চোখ ছোট করে বলল, "কতবড় মাছ বললে! দেড় মন? উরেববাস ! তা হলে তো মস্ত মাছই ধরেছ ! কোথা থেকে ধরলে, রাজবাড়ির পুকুর থেকে নাকি?"

দুঃখবাবু মাথা নেড়ে বলেন, "মাছের বৃত্তান্ত নয়। বড় কঠিন সমস্যা চলছে দাদা। আমি বোধ হয় এবার মারা পড়ব।"

পুঁটে গম্ভীর হয়ে বলে, "না রে ভাই, সে যুগ কি আর আছে? আগে তো এক পয়সাতেই ন্যাড়া হওয়া যেত। আজকাল মজুরি ঠেলে উঠেছে এক টাকায়। তা হলধর পুরনো খদের বলে কমই নেয়, মাত্র একটা আধুলি। তোমার কাছ থেকেও ওই পঞ্চাশ পয়সাই নেবে, আমি বলে দেবখন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখবাবু বললেন, "গাঁট্টার যা বহর দেখছি তাতে পয়সা দিয়ে আর ন্যাড়া হতে হবে না। গাঁট্টার চোটে চুল সব উঠে যাবে।"

বলেই একটু আঁতকে উঠলেন দুঃখবাবু। কারণ কথাটা মুখ থেকে বেরোতেই একটা রাম গাঁটা এসে পড়ল মাথায়।

দুঃখহরণকে পেছনে ফেলে পুঁটে সর্দার ফের হাটা ধরল। হাসি-হাসি মুখে রায়বাবু প্রাতভ্রমণ সেরে ফিরছেন। আহ্লাদি চেহারা, ফরসা, নাদুস-নুদুস। মুখে সদাপ্রসন্ন ভাব। হাতে রুপোর হাতলওলা লাঠি। সঙ্গে বিশাল আলসেশিয়ান কুকুর প্রহর।

"পাতঃপেন্নাম হই রায়বাবু। সব খবর ভাল তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সব খবর ভাল। তা তোমার খবর-টবর কী?"

"আজ্ঞে, তা যা বলেছেন। কুকুরের মতো ভাল জিনিস আর হয় না। কুকুরের কাছে মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে।"

রায়বাবু বুদ্ধিমান লোক। আর কথা বাড়ালেন না। বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। অনেকটা হাঁটা হয়েছে আজ। বাড়ি ফিরেই এক গেলাস নিমপাতার রস

খাবেন! বুকটা ঠাণ্ডা হবে। একটু এগোতেই দেখলেন, দুঃখমাস্টার দৌড়ে আসছেন।

“ও কী, ও মাস্টার? দৌড়োচ্ছ যে! বাড়িতে আগুন লাগেনি তো!”

তো!”

“আজ্ঞে না মশাই। দিনরাত ভূতের গাটা খাচ্ছি। আর পারা যাচ্ছে না।”

"ভূতের গাটা? সে আবার কী জিনিস? ভূতের কিল শুনেছি। গাঁটা তো শুনিনি।”

“খেলে বুঝতেন। ওঃ, ওই আবার । নাঃ, পারা যাচ্ছে না। আসি রায়মশাই, থামলেই গাঁটা মারছে।”

রায়বাবু একটু অবাক হলেও ব্যাপারটা তাঁর খারাপ লাগল না। দুঃখহরণ কুঁড়ে লোক, কোনওকালে শরীরের দিকে নজর দেয়নি। এই যে দৌড়ঝাঁপ করছে, এতে ওর উন্নতি হবে। কিন্তু ভূতের গাট্টা কী জিনিস, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

বাড়ি ফিরে রায়বাবু পরম তৃপ্তির সঙ্গে এক গেলাস নিমপাতার রস তারিয়ে-তারিয়ে খেলেন। ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রায়বাবু স্বাস্থ্য ছাড়া কিছু বোঝেন না। স্বাস্থের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন লিভার ভাল রাখাকে। ফলে চিরতা, কালমেঘ, শিউলিপাতা ইত্যাদি যত তেতো জিনিস আছে সারাদিন তা খেয়ে যান। বাড়ির লোকজন, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, কাজের লোক, এমনকী কুকুর-বেড়ালকেও খাওয়াতে চেষ্টা করেন। ফলে আজকাল সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। তাঁর রস খাওয়ার সময় হলেই স্ত্রী পাশের বাড়িতে, ছেলেমেয়েরা খাটের তলায়, ঠাকুর, কাজের লোক বাড়ির পেছনকার জঙ্গলে, বেড়ালরা বেপাড়ায় পালিয়ে যায়। শুধু প্রহরী পালায় না। তবে রায়বাবু রস খাওয়াতে এলে সে এমনভাবে দাঁত বের করে গড়-ড় গড়-ড় করে যে, রায়বাবু বিশেষ সাহস করেন না । তিনি ছাড়া আর যে কেউ তেতো খেতে চায় না এতে তিনি খুবই দুঃখ বোধ করেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন, দুনিয়াটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

ওদিকে দুঃখবাবু দৌড়চ্ছেন। দৌড়লে গট্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দৌড় বন্ধ করলেই খটাং করে মাথায় গাঁটা পড়ছে। সুতরাং তাঁকে দৌড়তেই হচ্ছে।

ব্যায়ামবীর ভল্লনাথ তার উঠোনে দাঁড়িয়ে মুগুর ভাঁজছিল। দুঃখবাবুকে সামনের রাস্তা দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়তে দেখে সে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে বলল, “দৌড়চ্ছেন কেন দুঃখবাবু? কদমতলার ভীমরুলের চাকে কেউ ঢ়িল দিয়েছে নাকি?”

দুঃখবাবুর জবাব দেওয়ার সময় নেই। তিনি দৌড়ে হওয়া হয়ে গেলেন।

ভল্লনাথ “ওরে বাবা রে বলে মুগুর ফেলে দৌড়ে গিয়ে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

খালের জলে হাবু বিশ্বাসের মাথাটা ভুস করে ভেসে উঠল। বিরক্তির গলায় বলল, “দিলে তো সব ভণ্ডুল করে। এতবড় মাগুর মাছটাকে সাপটে তুলেছিলাম প্রায়। আচ্ছা বেআক্কেলে লোক হে তুমি! শরীরটাই তাগড়াই, মাথায় গোবর।”

ভল্লনাথ দু'ঢোক জল খেয়ে ফেলল তাড়াহুড়োয়। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "ভীমরুলের চাকটা ভেঙেছে। আসছে সব ভোঁ-ভোঁ করে তেড়ে। ডুব দাও! ডুব দাও!"

হাবু বিশ্বাস খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে বলল, "ভীমরুল! সে তো জলের তলাতেও হুল দেয়। বাপ রে!"

বলে হাবু বিশ্বাস হাঁচোড়-পাঁচোড় করে খালের ওধারে উঠে ছুটতে লাগল।

নিমাই তার নিতাই দুঃখবাবুকে ছুটে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠল।

"দুঃখদাদা, হলটা কী? ও দুঃখদাদা..."

কিন্তু দুঃখবাবু থামলেন না, জবাবও দিলেন না। দৌড়তে লাগলেন। নিমাই তখন নিতাইকে বলল, "ছোটো তো, লোকটা দৌড়চ্ছে কেন জানতে হবে।"

দুজনেই দুঃখবাবুর পেছনে ধাওয়া করতে লাগল।

হরিহরের পাঠশালার কাছাকাছি নিমাই আর নিতাই প্রায় ধরে ফেলল দুঃখবাবুকে।

তিনজনকে ওরকম ছুটে যেতে দেখে পাঠশালার ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, "সার, বাঘ বেরিয়েছে! বাঘ বেরিয়েছে!"

হরিহর পণ্ডিত সঙ্গে-সঙ্গে পাঠশালা ছুটি দিয়ে বললেন, "তোমরাও সব দৌড়ে বাড়ি চলে যাও।"

ছুটি পেয়ে ছেলেরা সব হুল্লোড় করে বেরিয়ে পড়ল। তারপর দৌড়তে লাগল দুঃখবাবুর পেছনে-পেছনে। সঙ্গে চিৎকার, "বাঘ! বাঘ!"

"কোথায় বাঘ? অ্যাঁ! কোথায় বাঘ!" বলতে বলতে বন্দুক হাতে বাসব দত্ত খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল। হরেন চৌধুরী সারেগামা থামিয়ে তানপুরাটা বাগিয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, "অ্যাই খবর্দার! অ্যাই খবর্দার!" নয়ন বোস কপিকলের দড়ি বেয়ে কুয়োয় নেমে গেল। সোজা কথায় নবীগঞ্জে হুলুস্কুলু কাণ্ড। দৌড়োদৌড়ি, চেঁচামেচি।

দুঃখবাবু আর পারছেন না। দৌড়ঝাঁপের অভ্যাস নেই। শরীরও মজবুত নয়। নবীগঞ্জের পুবধারে মাধব ঘোষালের বাড়ির ফটক খোলা পেয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন। মাধব ঘোষাল বারান্দায় বসে তামাক খেতে-খেতে একটা পুথি দেখছিলেন। সোজা গিয়ে তাঁর সামনে পড়লেন দুঃখবাবু, "ঘোষালমশাই, রক্ষে করুন।"

গাঁয়ের সবচেয়ে বিচক্ষণ লোক বলে সবাই ঘোষালমশাইকে জানে। মাথা ঠাণ্ডা, বুদ্ধিমান, পরোপকারী। মাধব ঘোষাল দুঃখবাবুর দিকে চেয়ে পুথিটা রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "শ্যামা পালোয়ানের নাতির ঘরের পুতির অবস্থা যে শোচনীয় দেখছি। ওরে কে আছিস, এক গেলাস জল নিয়ে আয়।"

দুঃখবাবু ঢকঢক করে জল খেলেন। মাধব ঘোষাল কান পেতে কী একটু শুনে বললেন, "গাঁয়ে এত গোল কিসের?"

দুঃখবাবু একটু দম নিয়ে বললেন, “আমাকে নিয়েই গণ্ডগোল। আমি দৌড়চ্ছিলাম দেখে কেউ ভাবল ভীমরুল, কেউ ভাবল বাঘ। সব খামোখা দৌড়োদৌড়ি-চেঁচামেচি করে মরছে।”

“তুমিই বা দৌড়লে কেন?"

দুঃখবাবু যেন বেজায় অবাক হয়ে বললেন, “দৌড়ব না? ভূতটা যে দিনরাত গাট্টা মারছে। দৌড়লে আর মারে না। থামলেই মারে। এই দেখুন, মাথার পেছনে সব সুপুরি তুলে দিয়েছে।”

মাধব ঘোষাল দেখলেন। বাস্তবিকই তিন-চার জায়গা রীতিমত ফুলে আছে। ঘোষাল একটু চিন্তিত মুখে বলেন, “গাট্টা মারছে কেন তা কি আন্দাজ করতে পেরেছ?”

“আজ্ঞে না। কখনও কাতুকুতু দেয়, কখনও সুড়সুড়ি, কখনও গাট্টা। প্রথমটায় সুড়সুড়ি আর কাতুকুতুই দিত। তারপর হঠাৎ গাটা শুরু হয়েছে।”

মাধব ঘোষাল একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, “তার মানে সুড়সুড়ি আর কাতুকুতুতে কাজ হয়নি। তাই গাঁটা মারতে শুরু করেছে।”

দুঃখবাবু একটু অবাক হয়ে ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, “কাজ হয়নি! কাজ হয়নি মানে কি ঘোষালমশাই!”

মাধব ঘোষাল ভ্রূকুটি করে দুঃখবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, “কপালে তোমার এখনও বিস্তর গাট্টা আর দৌড়োদৌড়ি লেখা আছে।”

দুঃখবাবু আঁতকে উঠে বললেন, “সে কী? মরে যাব যে মশাই!”

“মরতে এখনই তোমাকে দিচ্ছে কে?”

****

রেলস্টেশন নবীগঞ্জ থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশন। সারাদিনে দুখানা আপ আর দু’খানা ডাউন গাড়ি যায়।

রাত দশটার ডাউন ট্রেনটা পাস করানোর জন্য পয়েন্টসম্যান ভজনলাল স্টেশনে এসেছে। এ-সময়টায় স্টেশনমাস্টারমশাই থাকেন না। ভজনলাল ডাল-রুটি পাকিয়ে রেখে সময়মতো চলে আসে। ট্রেন পাস করিয়ে দিয়ে খেয়ে ঘুম লাগায়। এই ট্রেনে যাত্রী থাকে না। কেউ নামেও না, ওঠেও না।

আজও ট্রেনটা পাস করাচ্ছিল ভজনলাল। কিন্তু ট্রেনটা এসে দাঁড়াতেই সামনের কামরার একটা দরজা পটাং করে খুলে গিয়ে একটা বিভীষিকা নেমে এল। পরনে জরির পোশাক ঝলমল করছে। এরকম লম্বাচওড়া লোক ভজনলাল জীবনে দেখেনি। দুখানা হাত যেন শালখুটি, কাঁধ দুখানা গন্ধমাদন বইতে পারে, আর বুকখানা যা চওড়া ভজনলালের খাটিয়াখানা বোধ হয় তাতে এটে যায়। লোকটা কামরা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সামনে ভজনলালকে দেখেই হুহুঙ্কারে জিজ্ঞেস করল, “উও কাঁহ?”

ভজনলাল এমন ঘাবড়ে গেল যে, হাত থেকে লাল-নীল বাতিটা খসে পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মে। সে দু হাত জোড় করে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "কৌন হুজুর?"

লোকটা ফের হুঙ্কার ছাড়ল, "কাঁহা হ্যায় উও? অ্যাঁ! কাঁহা ছিপা হুয়া হ্যায়?"

ভজনলাল কাঁপতে-কাঁপতে বলে, "নেহি মালুম হুজুর!"

লোকটা দুখানা বিশাল থাবায় ভজনলালের কাঁধ ধরে একটা রামঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "নেহি মালুম! নেহি মালুম! ক্যা নেহি মালুম রে? আভি উসকো লে আও। কাঁহা ছিপায়গা উও?"

ভজন ভয়ে আধমরা। বলল, "জি হুজুর। জরুর ঢুঁড় লায়েঙ্গে। লেকিন উনকো নাম তো বতাইয়ে।"

দৈত্যটা ভজনলালকে ছেড়ে দিয়ে কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে এবার বাংলায় বলল, "তাই তো! নামটা কী যেন! অনেক দিনের কথা কিনা। নামটা তো মনে পড়ছে না।"

ভজনলাল দম ফেলার সময় পেল। বড় ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। হাতজোড় করে বলল, "নামটা ইয়াদ না হলে কোই হরজা নেই হুজুর। লেকিন লোকটা দেখতে কেমুন আছে সিটা তো বোলেন।"

দৈত্যটা একটা বিশাল শ্বাস ছাড়ল। সেই শ্বাসের ধাক্কায় ভজন এক-পা পিছিয়ে গেল যেন। শ্বাস ছেড়ে দৈত্যটা বলল, "লোকটা রোগাপটকা, ফরসা, একটু টারা, মাথায় বাবরি চুল। বুঝলি? কোথায় লোকটা?"

ভজনলাল মাথা নেড়ে বলে, "মিলে যাবে হুজুর। জরুর মিলে যাবে। কাল হব্বিপুরে হাটবার আছে, বহুত আদমি আসবে। ওইরকম তিন-চারটা আদমি ধরে লিয়ে আসব।"

লোকটা বড়-বড় চোখে ভজনলালকে প্রায় ভস্ম করে দিয়ে বলল, "ফরসা বললাম নাকি? না, লোকটা কালোই হবে। আর ট্যারা নয়। অনেকটা চিনেম্যানের মতো দেখতে। আর রোগাপটকাও নয়। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা। বুঝতে পেরেছিস কার কথা বলছি?"

"জি হুজুর, মিলে যাবে।"

"লোকটাকে পেলে আমি কী করব জানিস?"

ভজন ভয়ে-ভয়ে বলে, "পিটবেন হুজুর। লোকটা মালুম হচ্ছে, বহোত বদমাশ আছে।"

লোকটা একটা হাত মুঠো পাকিয়ে বলল, "আগে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। তারপর ময়দার মতো ঠাসব, দলা পাকিয়ে ফেলব। তারপর সেই দলাটা দিয়ে ফুটবল খেলব। তারপর কিছুক্ষণ লোফালুফি করব, তারপর নদীতে ফেলে দেব। তারপর তুলে এনে মুগুর দিয়ে চ্যাপ্টা করব। তারপর...."

ভজনলাল মাথা নেড়ে বলে, "সমঝ গিয়া মালিক। আদমিটার নসিব খারাপ আছে। যে ইচ্ছা হয় করবেন হুজুর, আমি আখ মুদিয়ে থাকব।"

“মনে থাকে যেন, লোকটা বেঁটে, কালো, মাথায় টাক, দাঁতগুলো উঁচু, গাল তোবড়ানো।"

“জি হুজুর। এখানে সব কিসিম পাবেন। কাল হাটবারে পসন্দ করে লিবেন। আমি একটা-একটা করে আদমি ধরে এনে হুজুরের সামনে ফেলে দিব, হুজুর পসন্দ করে লিবেন।”

দৈত্যটা চোখ মিটমিট করে বলল, “পছন্দ! পছন্দ করার কথা উঠছে কেন রে? আমি তাকে মোটেই পছন্দ করি না।”

“জি হুজুর। আপনার বাত ঠিক আছে। হামি ভি তাকে পসন্দ করি না।”

“মনে থাকে যেন, লোকটা বেশ লম্বা, ফোকলা, মাথায় টাক কিংবা বাবরি চুল, চিনেম্যান বা কাফ্রির মতো দেখতে, নাকটা থ্যাবড়া হতে পারে আবার চোখাও হতে পারে্র।”

“জি হুজুর। খুব ইয়াদ থাকবে । আপনি এখন গিয়ে আরাম করুন।”

দৈত্যটা আর-একটা শ্বাস ফেলে গদাম-গদাম করে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর জোরকদমে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভজনলাল জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, “রামজি কি কৃপামে আজ তো বাঁচ গয়া। জয় রামজি, সীতা মিয়ি, বজরঙ্গবলি কি! কাল ক্যা হোগা রামজিকি মালুম।”

রাত এগারোটাতেই নবীগঞ্জ নিশুতি। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তাতে আবার কুয়াশা পড়েছে। পাঁচু বিষয়কর্মে বেরিয়েছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গায়ে চুপচুপে করে তেল মাখা, হাতে একটা থলি। থলিতে সিঁদকাঠি আছে, কুকুরের জন্য বিস্কুট আর মাংসের হাড় আছে, নানারকম চাবি আছে, শিক বাঁকানো আর কাঁচ কাটার যন্ত্রপাতিও আছে।

রায়বাবুর বাড়িতে চুরি করা শক্ত কাজ। রায়বাবুর একটা বিশাল কুকুর আছে। পাঁচু বার তিনেক চেষ্টা করে পেরে ওঠেনি। আজ সে তৈরি হয়েই এসেছে। গতকাল রায়বাবু ধান বেচে বেশ কয়েক হাজার টাকা পেয়েছেন। শোওয়ার ঘরে লোহার আলমারিতে রাখা আছে। কাজটা শক্ত। কিন্তু শক্ত কাজেই তো আনন্দ।

রায়বাবুর বাড়িটা বাইরে থেকে খুব ভাল করে দেখে নিল পাঁচু, কেউ জেগে আছে কিনা। জানলায় কান পেতে শুনল, ভেতরে শ্বাসের যে শব্দ হচ্ছে তা ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসের শব্দ কিনা। এসবের জন্য সূক্ষ্ম কান চাই। শিখতে অনেক সময় আর মেহনত খরচ হয়েছে পাঁচুর। তবে না সে আজ পাশ-করা চোর।

কুকুরটা সামনের বারান্দায় থাকে। সেদিকটায় যায়নি পাঁচু। কোনও শব্দও করেনি। তবু কুকুরটা বোধ হয় টের পেয়ে আচমকা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। পাঁচুর কাজ বাড়ল। বিরক্ত হয়ে সে সন্তপর্ণে এগিয়ে গিয়ে বাবান্দার গ্রিলের ভেতরে বিস্কুট আর হাড় দুটো ছুড়ে ফেলল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। বিস্কুট আর হাড়ে ঘুমের ওষুধ দেওয়া আছে। পাঁচ-ছ ঘণ্টা টানা ঘুম হবে।

একটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইল পাঁচু। কুকুরটা একটু দ্বিধায় পড়ল। তারপর জিনিসগুলো শুকল। তারপর হাড়খানা নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করল। তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

আর দেরি নয়। চটপট কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। পাঁচু উঠে দাঁড়াল। ঝোপের ওপাশ থেকে আরও একজন সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওঠাটা কিছু অদ্ভুত। উঠছে তো উঠছেই। যেন শেষ নেই। পাঁচুর মাথার ওপরেও বোধ হয় আরও হাত দেড়েক উঠে গিয়ে তবে লোকটার ওঠা শেষ হল। শুধু উঁচুই নয়, বহরের দিকটাও দেখার মতো। এত বড় বহরের মানুষ পাঁচু কখনও দেখেনি। সামনের বাড়িটা, এমনকী বাগানটা অবধি আড়াল হয়ে গেল।

অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করত, ভিরমি খেত বা দৌড়ে পালাত দৌড়ে পালানোর অবস্থা অবশ্য পাঁচুর নেই। ভয়ে হাত-পা সব অসাড় হয়ে গেছে। তবে তার অনেক দেখা আছে, অভিজ্ঞতাও প্রচুর। রাতবিরেতে বেরোলে কতরকম ঘটনাই ঘটে। সাপ, ভূত, পাগলা কুকুর। তবে এটি ব্রহ্মদৈত্য কিনা তা ঠাহর হল না তার। তবে শুকনো গলাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে তার গলা থেকে একটা ছাগলের ডাক বেরোল।

ব্রহ্মদৈত্য চাপা গলায় বলে উঠল, “তুই।”

গলা দিয়ে স্বাভাবিক স্বর বেরোল না! ফের ছাগলের ডাক। সেই ছাগলের গলাতেই পাঁচু বলে উঠল, “আমি!"

“তোকেই তো খুঁজছি! সেই ঢাঙা, সুটকো, হাড়গিলে, দাঁত উঁচু চেহারা”

পাঁচু বুদ্ধিমান। টপ করে বুঝতে পারল, লম্বাচওড়া হলেও লোকটা ব্রহ্মদৈত্য নয়। মানুষই। বুঝবার সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচুর গলার স্বর ফিরে এল। খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, “উনি আমার পিসেমশাই।”

“কে কার পিসেমশাই!”

“ওই যার কথা বললেন। ঢাঙা, সুটকো, হাড়গিলে, দাঁত উঁচু। সবাই ভুল করে কিনা। আমার আপন পিসেমশাই তো, তাই আমার সঙ্গে চেহারার খুব মিল। অনেকে যমজ ভাই বলে ভুল করে।”

দৈত্যটা যেন ভাবিত হল, “পিসেমশাই! পিসেমশাই! কোথায় তোর পিসেমশাই?”

“আছে মশাই, আছে। কিন্তু এত রাতে তাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে?”

লোকটা ঝোপ পেরিয়ে এসে পাঁচুর কাঁধ খামচে ধরে বলল, “কোথায় আছে? কোথায়?”

থাবা খেয়ে পাঁচু চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। কিন্তু বুদ্ধিটা গুলিয়ে যেতে দিল না। গলাটি মোলায়েম করে বলল, “আজ্ঞে আর ঝাঁকাবেন না, হাড়ে-হাড়ে খটখট শব্দ হচ্ছে। বলছি, একটু দম নিতে দিন।”

“তাকে কী করব জানিস? বস্তায় পুরে আছড়ে-আছড়ে ছেচে ফেলব। তারপর গরম জলে সেদ্ধ করব । তারপর গরম তেলে ভজিব।”

"খুব ভাল হয় তা হলে। দেখবেন আবার কাঁচা তেলে ছাড়বেন না । তেলটা বেশ ফুটে উঠলে, তবেই ছাড়বেন। নিজের পিসেমশাই বলেই কবুল করতে লজ্জা হয় মশাই, কিন্তু উনি খুব যাচ্ছেতাই লোক। এই দেখুন না, অগ্রহায়ণ মাসের ঠাণ্ডায় আমি ফ্যাঁ-ফ্যাঁ করে ঘুরছি, ট্যাঁকে পয়সা নেই, পেটে ভাত নেই, আর উনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।"

কাঁধে আর-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দৈত্যটা বলল, "কোথায় সে?"

"ওই যে বাড়িটা দেখছেন, সামনের ডান দিকের ঘরখানা, ওইখানে । তবে সাড়াশব্দ করবেন না। পিসেমশাইয়ের বন্দুক আছে। দুম করে বন্দুক চালিয়ে দিলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

"বন্দুক!" বলে লোকটা যেন ভাবিত হয়ে পড়ল। নিজের কপালে একটু টোকা মেরে মাথা নেড়ে বলল, "না, তার তো বন্দুক থাকার কথা নয়। তার বন্দুক ছিল না।"

"ছিল না বলে কি হতে নেই মশাই? দশ বছর আগে আমারও তো দাঁড়িগোঁফ ছিল না, তা বলে এখন কি হয়নি? চালের দর কি আগে পাঁচ টাকা কিলো ছিল? এখন কী করে পাঁচ টাকা হল বলুন! আগে তো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরত, তা বলে কি এখন ঘোরে? এখন পৃথিবীই তো দেখছি সূর্যের চারদিকে পাক মেরে-মেরে হয়রান হচ্ছে। এই নবীগঞ্জে আগে চোর-ডাকাত ছিল কখনও? তা বলে কি এখন চোর-ডাকাত হয়নি?"

লোকটা এসব কথা কানে তুলল না। কেমন যেন ভয়-খাওয়া গলায় বলল, "বন্দুক! বন্দুকটা কী জিনিস বলো তো! লম্বামতো দেখতে, দুম করে শব্দ হয়?"

"শব্দ বলে শব্দ! সে সাঙঘাতিক ব্যাপার। তার ওপর পিসেমশাইয়ের বন্দুককে বন্দুক না বলে কামান বলাই ভাল। গেল-বার পিসেমশাই এক ডাকাতকে গুলি করেছিলেন, ডাকাতের গায়ে গুলি লাগেনি বটে, কিন্তু শব্দেই সে মুর্ছা গেল। পরে পুলিশ এসে জল-টল দিয়ে তার মূর্ছা ভাঙায়। আরও কী হল জানেন? সেই শব্দে মশা-মাছি কাক-চিল সেই যে নবীগঞ্জ ছেড়ে পালাল, আর ছ মাসের মধ্যে এদিকপানে আসেনি।"

দৈত্যটা যেন একটু চঞ্চল হল, চারদিক চেয়ে হঠাৎ পাঁচুকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "বন্দুক! বন্দুক খুব খারাপ জিনিস। শব্দ হয় ।"

বলেই চোখের পলকে ঘুরে অন্ধকারে দুদ্দাড় করে পালাতে লাগল। লোকটার আক্কেল বলে কিছু নেই। মচাত করে একটা গাছের ডাল ভেঙে ফেলল, একটা টিনের ক্যানেস্তারা প্রচণ্ড শব্দে ছিটকে ফেলল, খটাস করে ফটক খুলল। আর সেই শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে রায়বাবু চেঁচাতে লাগলেন, "কে রে! কে ওখানে?"

নাঃ, আজও হল না। পাঁচু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। কিন্তু নবীগঞ্জে এই অসুরটা কোত্থেকে হাজির হল, মতলবটাই বা কী, সেটা জানতে হচ্ছে। রায়বাবু বাতি জ্বেলে লাঠি হাতে বেরিয়ে আসতে-আসতে হাঁকডাক করছেন। তাঁর কাজের

লোক, জোয়ান ছেলেরা, সব ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। পাঁচু ধীরেসুস্থে তার থলি গুছিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দিল।

দুঃখবাবুর আজকাল ঘুম খুব পাতলা হয়েছে। গট্টার ভয়ে সবসময়েই একটা আতঙ্ক। তবে ভালর মধ্যে এই যে, আগে যেমন যখন-তখন গাঁটা, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি হত, এখন তেমনটা হয় না। প্রথম গাঁটাটা আজকাল খুব ভোরের দিকে হয়। আর মজা এই গাঁট্টা খেয়েই উঠে পড়লে এবং দৌড়তে শুরু করলে আর কোনও উৎপাত থাকে না। দুঃখবাবু দৌড়লে যে ভূতটার কী সুবিধে, তা অনেক মাথা ঘামিয়েও দুঃখবাবু বুঝতে পারছেন না।

আজ মাঝরাতে হঠাৎ দুঃখবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে যেন অন্ধকারেও একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। সেই চোরটাই আবার এসেছে নাক? চোরকে দুঃখবাবুর কোনও ভয় নেই, কারণ চোর তাঁর নেবেটা কী? তিনি বরং আগন্তুকের সাড়া পেয়ে খুশিই হলেন। দুটো সুখ-দুঃখের কথা তো বলা যাবে।

"কে, চোরভায়া নাকি? আরে, এসো, এসো। বোসো দেখি জুত করে। শরীর-গতিক সব ভাল তো! বাড়ির খবরটবর সব ভাল? খোকাখুকিরা ভাল আছে তো! আর বউ? তিনি ভাল আছেন তো!"

চোরভায়া জবাব দিল না, তবে বিকট একটা শ্বাস ফেলল।

"তা বেশ হাফিয়ে পড়েছ দেখছি ভায়া! বোসো, বসে একটু জিরোও। তোমার মেহনত তো কম নয়। রাত জেগে খুবই পরিশ্রম করতে হয় তোমাকে। তা দুধ টুধ খাও তো নিয়মিত? এত পরিশ্রম, একটু দুধ-ঘি না হলে শরীরে এত সইবে কেন? আমি বলি কি, একটু চ্যবনপ্রাশ খেয়ে দ্যাখো, ওতে বেশ বল হয়।"

এই বলে ফস করে হ্যারিকেনের নিবু-নিবু সলতেটা একটু উসকে দিলেন দুঃখবাবু। আর তারপরেই বিকট মূর্তি দেখে তাঁর মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। এতবড় যে কোনও মানুষের চেহারা হতে পারে, তা জানা ছিল না তাঁর। তার ওপর আবার রাজারাজড়াদের মতো জরির পোশাক!

দৈত্যটা আর-একটা ঝড়ের মতো শ্বাস ফেলে বলল, "তা হলে তুই-ই সেই পামর?"

দুঃখবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হল, সেই ভূতটাই মূর্তি ধরে আসেনি তো! ভূতেরা অনেক কিছু পারে। যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার যার-তার রূপ ধারণ করে।

একটু কাঁপা গলায় দুঃখবাবু বলে উঠলেন, "আপনিই কি তিনি?"

দৈত্যটা বিশাল আর-একটা শ্বাস ফেলে বলে, "আমিই। তোকে কী করব জানিস! আগে তোকে ধরে গোটাকয়েক আছাড় দেব। তারপর বনবন করে ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলব। তারপর মুগুর দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করে রোদে শুকিয়ে পাঁপরভাজা বানাব। তারপর গুড়ো করে নস্যি বানিয়ে উড়িয়ে দেব ফু দিয়ে।"

দুঃখবাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমার ওপর আপনার এত রাগ কেন? দিন-রাত গাঁট্টা মারছেন, কাতুকুতু দিচ্ছেন, সুড়সুড়ি দিচ্ছেন, তাতেও হল

না? আমি রোগাভোগা, দুঃখী মানুষ, আমার ওপর এই অত্যাচার কি ভাল?”

দৈত্যটা অবাক হয়ে বলে, “গাঁট্টা? কাতুকুতু? সুড়সুড়ি? ফুঃ, ওসব আমার মোটেই পছন্দের জিনিস নয়। আমি চাই শঠে শাঠ্যং।”

এবার দুঃখবাবু খানিকটা দুঃখে, খানিকটা রাগে ফুঁসে উঠে বললেন, “আপনি মোটেই ভাল লোক নন। আড়াল থেকে গাঁট্টা মারেন, কাতুকুতু দেন, সুড়সুড়ি দেন, সাহস থাকলে সামনে এসে দাঁড়ালেই পারতেন। আড়াল থেকে লোককে যন্ত্রণা দেওয়া খুব খারাপ অভ্যাস। এখন তো খুব দাঁত বের করে এসে হাজির হয়েছেন, বলি এখন যদি আমি উলটে আপনাকে কাতুকুতু দিই? গাঁট্টা মারি? সুড়সুড়ি দিই?”

দৈত্যটা এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, “কাতুকুতু? ওরে বাবা, কাতুকুতু আমি মোটেই সইতে পারি না।”

“তা হলে! যা নিজে সইতে পারেন না, তা অন্যকে দেন কোন আক্কেলে? ছিঃ ছিঃ, আপনি অত্যন্ত খারাপ। অতি জঘন্য চরিত্রের লোক। আপনাকে কাতুকুতু দিলেও কাতুকুতুর অপমান করা হয়।”

দৈত্যটা কিছুক্ষণ দুঃখবাবুর দিকে বড়-বড় চোখে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, “না, তুই নোস। সে তোর চেয়ে লম্বা, তোর চেয়ে অনেক জোয়ান, বয়সেও বড়। তার মাথায় তোর মতো টাকও নেই।”

দুঃখবাবু এ-কথায় অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে বললেন, “সবাই ওইকথা বলে। সকলেই নাকি আমার চেয়ে লম্বা, আমার চেয়ে জোয়ান, আমার চেয়ে বড়, তাদের টাকও নেই। তাতে কী এমন অপরাধ হল শুনি! রোগা, বেঁটে, কমজোরি আর টেকোরা বুঝি মাগনা এসেছে পৃথিবীতে! তাদের বুঝি ধরে ধরে কেবল কাতুকুতু দিতে হয়? সুড়সুড়ি দিতে হয়? গাঁট্টা মারতে হয়?”

দৈত্যটা পিটপিট করে চেয়ে বলল, “কাতুকুতু খুব খারাপ জিনিস।”

দুঃখবাবু খুবই রেগে উঠছেন ক্রমে-ক্রমে। এবার প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, কাতুকুতু খারাপ, সুড়সুড়ি খারাপ। তার চেয়ে আরও খারাপ হল গাঁট্টা।”

দৈত্যটা দুঃখবাবুর সঙ্গে একমত হল না, মাথা নেড়ে বলল, “না, কাতুকুতুই সবচেয়ে খারাপ।”

দুঃখবাবু আরও একটু রেগে গিয়ে বললেন, “না, কাতুকুতুর চেয়ে গাঁট্টা আরও খারাপ। গাঁট্টার চোটে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমাকে মাইলচারেক দৌড়তে হয় তা জানেন?”

“দৌড় ভাল জিনিস।”

“মোটেই ভাল জিনিস নয়। দৌড়তে-দৌড়তে জিভ বেরিয়ে যায়। তবু কি থামবার উপায় আছে? থামলেই গাঁট্টা।”

“কাতুকুতুর চেয়ে গাঁট্টা ভাল।”

“না, কাতুকুতু তবু মন্দের ভাল।”

দৈত্যটা মাথা নেড়ে বলে, “কাতুকুতু খুব খারাপ।”

দুঃখবাবু রাগের চোটে দিশেহারা হয়ে বললেন, “কাতুকুতুই যদি খারাপ তা হলে আপনি আমাকে গাঁট্টা মারেন কেন?”

দৈত্যটা মাথা চুলকে বলল, “গাট্টা! না, গাঁট্টা তো আমি মারি না। যার ওপর রাগ হয় তাকে ধরে আমি গামছার মতো নিংড়ে ফেলতে ভালবাসি। তারপর কী করি জানিস? নিংড়োবার পর গামছার মতোই ঝেড়ে নিয়ে তারপর পাকিয়ে-পাকিয়ে একটা বল বানাই। তারপর বলটা দিয়ে খুব ফুটবল খেলি…:

“গাঁট্টা তা হলে কে মারে?”

“তার আমি কী জানি! তবে তুই অতি নচ্ছার লোক, তোকে গাঁট্টা মারাই উচিত।”

“আমি নচ্ছার লোক?”

“যারা কাতুকুতু দেয় তারা অত্যন্ত পাজি লোক।”

“আমি কখনও কাউকে কাতুকুতু দিই না।”

দুঃখবাবু খুব অভিমানভরে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন,"এই যে রোজ আপনি আমাকে গাঁট্টা মারেন, তবু হাতের কাছে পেয়েও আমি আপনাকে একবারও কাতুকুতু দিয়েছি কি?”

দৈত্যটা একটু যেন শিহরিত হয়ে বলল, “বাপ রে।”

“একবারও দিয়েছি? বলুন!”

দৈত্যটা জবাব না দিয়ে তড়িঘড়ি দরজা খুলে পালিয়ে গেল । কেউ বিশ্বাস করবে না । সেইজন্য কাউকে বলেও না পুঁটে সর্দার যে রাত বারোটার পর তার কান খুলে যায়। তখন হড়হড় করে কানের মধ্যে এতসব শব্দ ঢুকতে থাকে যে, পুঁটে আর ঘুমোতে পারে না। ঝিঁঝিঁর ডাক, বাতাসের শব্দ, ইঁদুরের চিড়িক অবধি তখন বাজের শব্দের মতো কানে এসে লাগে । পুটে তাই বিকেল থেকে রাত বারোটা অবধি ঘুমোয়। রাত বারোটায় উঠে দিনের কাজ শুরু করে দেয় । প্রথমে ডন বৈঠক করে, তারপর পুজোআচ্চা, একটু প্রাতভ্রমণ সেরে রাত আড়াইটেয় ছোলা-গুড় খেয়ে দাওয়ায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী বা কীর্তন গায় । ভোর পাঁচটায় আবার কান বন্ধ হয়ে যায় ।

আজও রাত বারোটায় ঘুম থেকে উঠে দাঁতন চিবোতে-চিবোতে কুয়োর পাড়ে যাবে বলে দরজা খুলে উঠোনে নামতেই পুটে একটু চমকে গেল । অপদেবতা নাকি? উঠোনের যে ফটকটা আছে তার ধারে ওটা কে দাঁড়িয়ে? মনিষ্যি বলে তো মনে হয় না। এত বিরাট চেহারার কি মানুষ হয়? বারকয়েক রামনাম জপ করে নিয়ে গলাখাকারি দিয়ে পুটে বলল, “কে ওখানে?”

দাঁত কড়মড় সহ জবাব এল, “তোকেই খুঁজছি।”

পুটে সদরের হাত থেকে জলের ঘটিটা ঠকাস করে পড়ে গেল । দাঁতনটাও ধরে রাখতে পারল না কাঁপা হাতে । এ যে যমদূত, তাতে আর তার সন্দেহই রইল না। পরনে ঝলমলে জরির পোশাক । নিতে এসেছে।

কিন্তু এমন কীই-ব বয়স হল তার? এখনও দাঁত নড়েনি, চুলে তেমন পাক ধরেনি, এখনও কাঠ কাটতে পারে, জল তুলতে পারে, দশ-বিশ মাইল হাঁটতে পারে। যতীন-ময়রার সঙ্গে কথা হয়ে আছে, যেদিন পুঁটে সর্দারের একশো বছর পুরবে সেদিন যতীন তাকে একশোটা স্পেশাল সাইজের রাজভোগ খাওয়াবে।

এক-একখানার ওজন দেড় পোয়া । নবসঙঘ ক্লাবের ছেলেরা বলেছে, পুঁটে সর্দারের একশো বছর বয়স হলে তারা চাঁদা তুলে একশোখানা একশো টাকার নোট দিয়ে মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে গাঁয়ে মিছিল বের করবে। ইস, একেবারে তীরে এসে তরী ডুবল যে! উত্তেজনায় নিজের মাথায় একবার হাত বোলাল পুঁটে, এঃ, পয়সা খরচ করে আজ ন্যাড়া হওয়ার দরকারই ছিল না । মরবে জানলে কোন আহাম্মক পয়সা খরচ করে ন্যাড়া হয়!

গলাখাকারি দিয়ে পুটে বলল, "পেন্নাম হই যমদূতমশাই। তা এখনই কি যেতে হবে? নাকি দাঁতনটা করে নেব?"

যমদূত দাঁত কড়মড় করতে-করতে বলল, "তোর সময় ফুরিয়েছে।"

"আজ্ঞে হিসেবটা ঠিকমতো দেখে নিয়েছেন তো! হিসেবে কোনও ভুলভাল নেই তো?"

"কিসের হিসেব?"

"আজ্ঞে চিত্রগুপ্ত মশাইয়ের খাতাখানার কথা বলছি । এত লোকের আয়ুর হিসেব কি সোজা কথা? ভুলভাল হতেই পারে । উধের পিণ্ডি বুধের ঘাড়ে চাপল হয়তো।"

"আমাকে অাঁক শেখাচ্ছিস?"

জিভ কেটে পুঁটে বলে, "আজ্ঞে না। আমার তেমন আস্পর্দা এখনও হয়নি । তবে কিনা অপরাধ যদি না নেন তো বলি, অনেক সময়ে নাম-ঠিকানাও ভুল হয় কিনা । আর-একবার নাম-ঠিকানাটা বরং মিলিয়ে দেখে নিন।"

যমদূত দাঁত কড়মড় করে বলল, "তুই-ই সেই লোক।"

পুঁটে বলল, "যে আজ্ঞে, তা হলে তো কথাই নেই। তা ওদিককার রাস্তাঘাট কেমন?"

"কোথাকার রাস্তা?"

"আজ্ঞে যমপুরীর রাস্তার কথাই বলছি। ভাঙাচোরা, খানাখন্দ নেই তো? বলেন তো লণ্ঠনটা সঙ্গে নিতে পারি। যেতে-যেতে আবার বৈতরণীর খেয়া না বন্ধ হয়ে যায় ।"

"আমাকে যমপুরীতে পাঠাতে চাস?"

জিভ কেটে পুটে বলে, "না, না, ছিঃ ছিঃ! যমপুরীতে পাঠাব কি? সেটা যে আপনার বাড়ি । এমনি বলছিলাম আর কি। তা ওদিককার খবরটবর সব ভাল তো! যমদাদা ভাল আছেন তো?
আর আমাদের যমুনাদিদি? তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন? দাওয়ায় এসে বসে একটু জিরোন । রাস্তা তো কম নয় । হেঁটেই এলেন নাকি? গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই সঙ্গে?"

বলে পুঁটে হেঃ হেঃ করে ঘাবড়ে-যাওয়া কাষ্ঠহাসি হাসল। তারপর শশব্যস্তে বলল, "কী নিতে হবে বলুন তো সঙ্গে! গামছা তো একটা লাগবেই। কয়েকটা দাঁতন নিই বরং, কী বলেন? আর ঘটিখানাও, নাকি? কাপড়জামা নিতে হবে না সঙ্গে?"

যমদূত সামনে এগিয়ে এসে বলল, "তোকে যমের বাড়ি পাঠাব বলেই তো এতদূর আসা।"

পুঁটে হাতজোড় করে বলল, "এসে খুব ভাল করেছেন। একদিন আগে এলে আরও ভাল হত। তা হলে আর পয়সা খরচ করে ন্যাড়াটা হতাম না। আপনিও চুলের ঝুঁটি ধরে দিব্যি টেনে নিতে পারতেন। খরচাটার কথাও একটু ভেবে দেখুন। আগে ন্যাড়া হতে মাত্র একটি পয়সা লাগত। এখন সেই দর ঠেলে কোথায় উঠেছে জানেন? পুরো এক টাকায়। বেঁচে থেকে কোনও সুখ নেই, বুঝলেন, কোনও সুখ নেই। জিনিসপত্রের যা দাম হয়েছে শুনলে আপনি মূর্ছা যাবেন। আজ সকালে কত দরে সরপুটি কিনেছি জানেন? শুনলে পেত্যয় যাবেন না, বারো টাকা। তাও কি দেয়? ষোলো টাকার এক পয়সা ছাড়বে না। অনেক ঝোলাকুলি করে তবে বারো টাকায় রফা হল। বলুন না আজ্ঞে। তাড়াহুড়ো কিছু নেই তো মশাই, আমরা তো আর ট্রেন ধরছি না। বসে একটু জিরিয়ে নিন। আমি টক করে কাজগুলো সেরে ফেলি।"

"কী কাজ?"

মুখে ফেলে রওনা দেবখন। বেশিক্ষণ লাগবে না। কতটা পথ হবে বলুন তো! বেলাবেলি পৌছনো যাবে?"

"কোথায় যাবি?"

"কেন, যমের বাড়ি! হেঃ হেঃ, রাস্তাঘাট তা হলে বেশ ভালই বলছেন তো! তবে সাবধানের মার নেই। আজ সকালেই শুনলাম, রাজবাড়িতে খুব সাপের উপদ্রব হয়েছে। লাঠিগাছটা বরং সঙ্গে নেব'খন। মরতেই যাচ্ছি বটে, কিন্তু সাপখোপের হাতে অপঘাতে প্রাণটা দিই কেন?"

যমদূত একটু যেন ভড়কে গিয়ে বলে উঠল, "লাঠি। লাঠি দিয়ে কী হবে? না, লাঠির দরকার নেই।"

"নেই বলছেন? লাঠি কিন্তু খুব ভাল জিনিস। বন্দুক, পিস্তল, তলোয়ার, রামদা বিস্তর চালিয়েছি বটে কিন্তু দেখলাম, লাঠির কোনও তুলনা নেই। একখানা লাঠি হাতে রাখলে যেন বল-ভরসা এসে যায়। তখন যমকেও ভয় করে না।"

যমদূত ঘন-ঘন মাথা নেড়ে বলল, "না, না, লাঠির দরকার নেই। তলোয়ার-টলোয়ারও খারাপ জিনিস।"

"নেব না বলছেন?"

যমদূত ধমক দিয়ে উঠল, "না। খবদার না।"

পুঁটে বেজার মুখে বলল, "তা হলে থাক। লাঠিখানা আমার অনেকদিনের বন্ধু কিনা, তাই নিতে চাইছিলাম। আমার সঙ্গে সেও একটু যমপুর ঘুরে আসত। পাকা

গিটেল বাঁশের লাঠি । কত মাথা ফাটিয়েছি, কত হাত-পা ভেঙেছি লাঠি দিয়ে । রাজামশাই খুশি হয়ে গাঁটগুলো পেতল দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন । গুহ্যকথা প্রকাশ করা ঠিক নয়, তবে আপনি আপনজন বলেই বলছি, আমার লাঠি কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধ। গোলক ওস্তাদের দলের সঙ্গে যখন আমাদের দাঙ্গা লাগল তখন তো বারোজন ঘিরে ধরে সড়কি, তলোয়ার চালিয়ে আমাকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল আর কি । বললে পেত্যয় যাবেন না, তখন আমার হাত থেকে খসেপড়া ওই লাঠি নিজে থেকেই শূন্যে উঠে দমদম পিটিয়ে সেই বারোজনকে তেপান্তর পার করে দিয়ে এসেছিল । আর একবার...”

যমদূত এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, “তোকে আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না । এই গাঁয়ের লোকগুলো অত্যন্ত পাজি ।”

একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে পুঁটে বলল, “যে আজ্ঞে । নবীগঞ্জের লোকেরা খুবই পাজি। এতই পাজি যে, যম অবধি তাদের ছোঁয় না। তাই বলছিলাম, ঠিকানাটা ভুল হয়নি তো! একটু ভাল করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেখুন তো! মাইল তিনেক উত্তরে শিবগঞ্জ আছে। সেখানে চুনো সর্দার বলে একজন থাকে । তার শুনেছি একশো বিরাশি বছর বয়স । সেই হবে তা হলে । এ-বেলা পা চালিয়ে চলে যান, পেয়ে যাবেন তাকে।”

দৈত্যটা মাথা নেড়ে বলল, “না রে, না । তার এই নবীগঞ্জেই আসার কথা । হব্বিপুর স্টেশনে নেমে নবীগঞ্জ । আমার খুব মনে আছে । কিন্তু লোকটা যে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে তা বুঝতে পারছি না।”

আশার আলোটা আরও উজ্জ্বল হল । একটু হাঁফ ছেড়ে পুটে বলল, “ওঃ, তাই বলুন? আমারও মনে হচ্ছিল কোথায় একটা ভুল হচ্ছে। আমার তো আর মরার বয়স হয়নি । চিত্রগুপ্তেরও একটু ভীমরতি হয়েছে মশাই, বুড়ো বয়সের তো ওইটেই দোষ কিনা! তবে এটুকু বলতে পারি, যাকে আপনি খুঁজছেন সে আমি নই।”

যমদূত একটু হতাশ গলায় বলে, “তা হলে সে কোথায়?”

আশার আলোয় এখন চারদিক একেবারে ঝলমল করছে । পুঁটে একগাল হেসে বলে, “আছে কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে । বলেন তো, আপনার সঙ্গে আমিও একটু খুঁজে দেখতে পারি।”

“খুঁজবি?”

“আজ্ঞে, আপনি স্বয়ং যমরাজার লোক, আপনার জন্য দরকার হলে প্রাণও দিতে পারি। তা লোকটা কে বলুন তো!”

যমদূত মাথা চুলকে বলল “বেঁটেই হবে বোধ হয়, রোগাপান, মাথায় টাক।”

পুঁটে উজ্জ্বল হয়ে বলল, “তাই বলুন, বেঁটে, রোগা, মাথায় টাক হচ্ছে দুঃখবাবু, রাজবাড়ির সরকারমশাই, গাইয়ে হরেন চৌধুরী।”

যমদূত ঘন-ঘন মাথা চুলকে বলল, “আবার লম্বাও হতে পারে, বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।”

"তার আর ভাবনা কী? এ নির্ঘাত শিকারি বাসব দত্ত, নয়তো মহিম হালদার, না হলে ব্যায়ামবীর ভল্লনাথ হতেই হবে।"

"রোগা আর লম্বা যদি হয়?"

"তা হলেই বা চিন্তা কিসের? হাবু বিশ্বাস আছে, হরিহর পণ্ডিত আছে, নয়ন বোস আছে।"

যমদূত একটা ঝড়ের মতো শ্বাস ফেলে বলল, "এ-গাঁয়ের লোকেরা অতি পাজি। নাঃ, লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

এই বলে যমদূত অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল তা আর ঠাহর হল না পুঁটে সর্দারের। যেখানে খুশি যাক, আপাতত ধড়ে যে প্রাণটা বহাল রইল তাতেই পুটে খুশি। যমদূত পাছে ফিরে আসে সেই ভয়ে পুঁটে তাড়াতাড়ি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। ভোরের আগে আর বেরোচ্ছে না।

রাত পোয়ানোর আগেই অবশ্য আরও অনেকের সঙ্গেই দৈত্যটার মোলাকাত হল। নয়ন বোস মূর্ছা গেল, হরিহর পণ্ডিত আমগাছে উঠে বসে রইল। হাবু ঘোষ তার লুকনো টাকা ঘুষ দিয়ে দৈত্যটাকে খুশি করার চেষ্টা করল। বাসব দত্তর জ্বর আর পেটের গোলমাল হতে থাকল।

ভাঙা, প্রকাণ্ড রাজবাড়ির দোতলার একখানা ঘরে বীরচন্দ্র থাকে। দুশো বছরের পুরনো একখানা পালঙ্ক আর কিছু আসবাব আছে। এ ছাড়া বীরচন্দ্রের আর বিশেষ কিছু নেই। সামান্য জমিজমার আয় থেকে কোনওরকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে। বীরচন্দ্র খুবই লাজুক মানুষ। রাস্তায় বেরোলে এখনও লোকে তাকে রাজা বলে প্রণাম করে, অনেকে নজরানা দেয়, সেই ভয়ে বীরচন্দ্র বাইরে বেরনো ছেড়েই দিয়েছে। তার কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। বীরচন্দ্রের একটাই শখ, বীণা বাজানো। বীণার শব্দ পাছে লোকের কানে যায় সেইজন্য বীরচন্দ্র মাঝরাতে উঠে বিভোর হয়ে বীণা বাজায়। তার মাঝে-মাঝে মনে হয়, এই বীণার জন্যই সে বেঁচে আছে।

আজও মাঝরাতে তন্ময় হয়ে বীণা বাজাচ্ছিল বীরচন্দ্র। হঠাৎ শুনতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে ভারী পায়ে কে উঠে আসছে। লাজুক বীরচন্দ্র বাজনা বন্ধ করে দিয়ে বসে রইল। এত রাতে কে আসবে?

দরজায় ঘা দিয়ে কে যেন বলে উঠল, "সে কোথায় রে?"

বীরচন্দ্র উঠল। লাজুক হলেও সে একটুও ভিতু নয়। চেহারাটা যথেষ্ট লম্বাচওড়া এবং রাজকীয়। তার গায়েও খুব জোর। দরজাটা খুলে সে দেখল, জরির পোশাক পরা বিরাট লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

বীরচন্দ্র একটু অবাক হয়ে বলল, "কী চাই?"

দৈত্যটা কুতকুতে দুই চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "লোকটা কোথায়?"

বীরচন্দ্র লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে না বটে, কিন্তু তার পর্যবেক্ষণ তীক্ষ, বুদ্ধি ধারালো এবং কাণ্ডজ্ঞানও টনটনে। সে লোকটার দিকে চেয়েই বুঝতে

পারল, লোকটা দেখতে যত ভয়ঙ্কর আসলে তত বিপজ্জনক নয় ।

সে মৃদু হেসে বলল, “এখানে তো আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। আপনি কাকে খুঁজছেন?”

“আরে ওই যে সিড়িঙ্গে চেহারার লম্বা বেঁটেপানা লোকটা! একমাথা টাক, তার ওপর বাহারে টেরিকাটা বাবরি। গায়ের রং কালো হলে কী হবে, টকটক করছে ফরসা।”

বীরচন্দ্র দরজা ছেড়ে দিয়ে বলল, “আসুন ভেতরে।”

****

ভোর হতে-না-হতেই নবীগঞ্জে হইচই পড়ে গেল । কেউ বলে ভূত, কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে রাক্ষস, কেউ বলে যমদূত ।

মাধব ঘোষাল গাঁয়ের সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষ, সবাই তাঁকে গাঁয়ের মাতব্বর বলে মানে ।

ভোরবেলা নবীগঞ্জের লোক এসে সব জড়ো হল মাধব ঘোষালের বৈঠকখানায় । যারা দেখেছে তারাও, যারা শুনেছে তারাও।

হারু ভটচার্য বলল, “নবীগঞ্জে অভাব-অভিযোগ মেলা আছে বটে, কিন্তু রাক্ষসের উৎপাত কোনওকালে ছিল না । বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে রাক্ষসটা এল কোত্থেকে তাই ভাবছি। এ তো বড় চিন্তার কথা হল ঘোষালমশাই।”

ভজনলাল বলে উঠল, “উ তো সবাইকে খেয়ে লিবে । হামাকেই খেয়ে লিছিল । তো হামি হাতজোড় করে বললাম, 'রাক্ষসজি, একটু বইসুন, আমি থোড়া ডাল-রোটি খেয়ে লেই, তারপর যদি আপনি হামাকে খান তো খেতে মিষ্টি লাগবে।”

পাঁচু একটু পেছনে ছিল । সে বলল, “রাক্ষস-টাক্ষস নয়, আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে । ঘোষালজ্যাঠা, আমার মনে হয় এ হল বিভীষণ । বিভীষণের তো মৃত্যু নেই। কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল এতদিন । হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে । তবে কাকে যেন খুঁজছিল । ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

ভজনলাল বলল, “ও বাত ঠিক । রাক্ষসজি কাউকে টুড়ছে।”

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে এসে দুঃখবাবু ভিড় ঠেলে ঢুকলেন । হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, “একটা কথা টক করে বলে দিয়ে যাই ঘোষালমশাই, ভূতটা কাতুকুতু পছন্দ করে না । একটা বেঁটে, মোটা, লম্বা, রোগা, ফরসা আর কালো লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুবই জটিল ব্যাপার। কিন্তু আমার আর দাঁড়ানোর সময় নেই! উঃ..ওই আবার গট্রিা পড়ল । যাই... ”

সকাল থেকে কান ফের বন্ধ হয়ে গেছে পুঁটে সর্দারের ।

লোকের মুখ দেখে বক্তব্য অনুমান করার চেষ্টা করতে-করতে সে বলল, “যমদূত বাবজিকে কাল রাতে এমন ঠকান ঠকিয়েছি যে, আর বলার নয়। ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আর কি! মুখে-মুখে হিসেব কষে দেখিয়ে দিলাম যে, আমার মরার বয়সই হয়নি । তখন আর রা কাড়ে না । মিনমিন করে বলল, “যাই হোক একটা ধরে নিয়ে যেতেই হবে, নইলে যমরাজা রেগে যাবেন । কিন্তু কাকে যে নিয়ে গেল, বুঝতে পারছি না ! সকালে উঠে সারা নবীগঞ্জে টহল দিয়ে দেখলাম, সবাই দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। ”

হরিহর পণ্ডিত মাথার ঘাম মুছে বলল, “খুব ফাঁড়াটা গেছে রাত্তিরে । গাছে উঠে বসে আছি, তাতেও নিস্তার নেই । গাছ ধরে এমন ঝাঁকাচ্ছিল যে, পাকা আমটির মতো আমার খসে পড়ার কথা । গায়ত্রী জপ করতে থাকায় পড়িনি। ”

নয়ন বোস একটা আংটি অদৃশ্য করে হাতের তেলোয় একটা বলের আবির্ভাব ঘটিয়ে বলল,“আমার জানালার শিক তো বেঁকিয়েই ফেলেছিল প্রায় । আমি তাকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যাটা খুব চালাক । আমার চোখে ভয়ে চোখই রাখছিল না । ”

হাবু ঘোষ একটু খেঁচিয়ে উঠে বলল, “আর কেরদানি দেখিও না । তাকে দেখে তো মূর্ছা গিয়েছিলে ।”

নয়ন গম্ভীর হয়ে বলল, “আপনি ওসব বুঝবেন না । হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করেও যদি না পারা যায় তা হলে সেটা নিজের ওপরেই বর্তায় । ওকে বলে হিপ্রনোটিক ব্যাকল্যাশ । সোজা কথা, আমি নিজের হিপনেটিজমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ”

হাবু ঘোষ গরম হয়ে বলল, “দ্যাখো, কথায়-কথায় ইংরেজিতে গালমন্দ কোরো না। রাসকেল, ইডিয়ট বলো ঠিক আছে । সে তবু সওয়া যায়। কিন্তু ওই ব্যাকল্যাশ-ট্যাকল্যাশ খুব খারাপ কথা।”

ইতিমধ্যে ভিড় দেখে হরিদাস চিনেবাদাম ফিরি করতে চলে এসেছে। পঞ্চানন চায়ের কেটলি আর ভাঁড় নিয়ে এসে চা বিক্রি করতে লেগেছে । বাউল চরণদাস গান গেয়ে ভিক্ষে চাইছে ।

মাধব ঘোষাল খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “এত মানুষ যখন তাকে দেখেছে তখন ঘটনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না । কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? ভাল করে খোঁজা হয়েছে?”

সবাই প্রায় সমস্বরে জানাল যে, সারা গাঁ অতিপতি করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি ।

মাধব ঘোষাল চিন্তিত মুখে বললেন, “আপনারা সবাই বাড়ি যান । রাতে সবাই মিলে পালা করে গাঁ পাহারা দিতে হবে । কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, রাক্ষস, খোক্কস, দৈত্য, দানো যেই হোক, ক্ষতি করার হলে কাল রাতেই করত! তা যখন করেনি তখন ভয় পাওয়ার দরকার নেই। একটু সাবধান থাকলেই হবে । ”

ধীরে-ধীরে সবাই চলে গেল। কিন্তু মাধব ঘোষালের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুছল না। তিনি উঠে ধুতি-জামা পরলেন। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোলেন।

মাধব ঘোষাল জানেন, গাঁয়ের লোক সব জায়গায় খুঁজলেও একটা জায়গায় খোঁজেনি, সেই জায়গাটার কথা কারও মাথাতেও আসবে না। সেটা হল রাজবাড়ি।

আর কেউ না গেলেও রাজবাড়িতে মাধব ঘোষালের যাতায়াত আছে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজবাড়ির কুলপুরোহিত ছিলেন। এখন সেই প্রথা উঠে গেলেও সম্পর্কটা বজায় আছে। মাধব বীরচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করেন। বীরচন্দ্রের অনেক গুণ, কিন্তু মুখচোরা আর লাজুক বলে জীবনে তেমন কিছুই করতে পারেনি,

শুধু বীণা বাজায়। মাধবের ভয় হচ্ছিল, দৈত্য বা দানো যেই হোক সে বীরচন্দ্রের কোনও ক্ষতি করেনি তো!

একটু ঘুরপথে লোকের চোখ এড়িয়ে মাধব এসে রাজবাড়িতে ঢুকলেন।

ভুজঙ্গ হালদার আজও বাজারে যাচ্ছিলেন। মাধবকে দেখে তটস্থ হয়ে বললেন, "পরেশ ভটচার্য মশাই যে! ভাল আছেন তো"

মাধব ঘোষাল একটু হেসে বললেন, "ভালই আছি হে ভুজঙ্গ। তা তোমাদের খবরটবর কী?"

ভুজঙ্গ ঠোঁট উলটে বললেন, "খবর আর কি? সেই থোড়-বড়ি-খাড়া। ডাল-চচ্চড়ি খেয়ে কোনওরকমে বেঁচে থাকা। আজ আবার রাজবাড়ির বাজারের হুকুম হয়েছে। কে জানে বাবা কারা খাবে। তা রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন নাকি নগেনবাবু? যান ওপরে চলে যান।"

মাধব ঘোষাল বুঝলেন, তাঁর অনুমানই ঠিক। এখানেই আছে। নইলে মোটা বাজারের হুকুম হত না। চারদিকটা চেয়ে দেখলেন মাধব। একসময়ে রাজবাড়িটা ছিল বিশাল। এখন সামনের মহলটা ভেঙে পড়ে ভগ্নস্তূপ হয়ে আছে। অন্দরমহলের অনেকটাই ভাঙাচোরা। আগে এই রাজবাড়ির কত জাঁকজমক ছিল। হাতিশাল, আস্তাবল, গোয়াল। সেপাই-সান্ত্রি, দাস-দাসী। নহবতখানা থেকে রোজ সকালে শিঙা বাজত। তার এখন কিছুই নেই। বীরচন্দ্র খুবই কায়ক্লেশে থাকে। ভাল করে খাওয়া জোটে না, নতুন পোশাক কেনার সামর্থ্য নেই বলে ছেড়া-ময়লা পরে থাকে। বীরচন্দ্র মাধবকে কয়েকবারই বলেছে, আমার যদি টাকা থাকত তা হলে বাবুগিরি না করে আমি এই নবীগঞ্জের উন্নতি করতাম।

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহল্লায় গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন।

দোতলার বিশাল বৈঠকখানায় বীরচন্দ্র একা বসে বিষন্নমুখে কী যেন ভাবছিল। মাধবকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল, "আসুন জ্যাঠামশাই।"

মাধব স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করে বললেন, "তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এলাম। কাল রাতে কি কোনও ঘটনা ঘটেছে? সারা গাঁয়ে তো হুলুস্কুলু

পড়ে গেছে, গাঁয়ে নাকি একটা রাক্ষস বা দানো বা ভূত কিছু একটা ঢুকেছে। অনেকেই দেখেছে তাকে।”

বীরচন্দ্র একটু হাসল। বলল, “সবাই খুব ভয় পেয়েছে বুঝি ?”

“ভীষণ, সারা গাঁয়ে এখন ওই একটাই আলোচনা।”

বীরচন্দ্র ফের বিষন্ন হয়ে বলল, “ভয় পেলে লোকে ভুল দেখে। ভাল করে লক্ষ করলে বুঝতে পারত, লোকটা দৈত্য, দানো, অপদেবতা কিছুই নয়, তবে খুব বড়সড় চেহারার একজন মানুষ !”

“সে কি তোমার কাছে আছে এখন ?”

বীরচন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, “আছে। তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।”

“তোমার দুর্জয় সাহস। লোকটা কেমন না জেনে আশ্রয় দেওয়া কি ঠিক হয়েছে বিরু ?”

বীরচন্দ্র বিষন্নমুখে বলল, “লোকটা পাগলাটে ধরনের হলেও বোধ হয় বিপজ্জনক নয়। স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। আমি আশ্রয় না দিলে আজ সকালে নবীগঞ্জের লোকেরা ওকে হয়তো রাক্ষস বা দৈত্য মনে করে সবাই মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলত। লোকে ভয় পেলে তো আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।”

মাধব একটু চিন্তা করে বললেন, “বোধ হয় তুমি বিচক্ষণের মতোই কাজ করেছ। লোকটার পরিচয় কিছু জানতে পারলে? কী চায় ও?”

বীরচন্দ্র চিন্তিত মুখে বলল, “ও একজন লোককে খুঁজছে। কিন্তু সে যে কে, তা ঠিকঠাক বলতে পারছে না। চেহারার বিবরণ এক-একবার এক-একরকম দেয়, নামও নানারকম বলছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, লোকটার ওপর ওর খুব রাগ। ওর ধারণা, লোকটা নবীগঞ্জে এসেছে বা শিগগিরই আসবে। আমি সেইজন্যই একটু চিন্তিত জ্যাঠামশাই।”

“কেন বলো তো ! চিন্তার কী আছে ?”

“ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, যার সন্ধানে ও এসেছে সেই লোকটা খুবই খারাপ ধরনের। একটা কোনও মতলব হাসিল করতে এসেছে। সেই লোকটা বোধ হয় এরও কোনও ক্ষতি করেছিল কখনও। কিন্তু কী ক্ষতি করেছিল তা বলতে পারছে না। ওর মনে নেই। শুধু মনে আছে, ক্ষতি একটা করেছিল।”

“নামধাম কিছু জানতে পারলে ? কেমন লোক এ ?”

“নাম বলছে কিঙ্কর। চেহারা দেখে মনে হয়, কুস্তিটুস্তি করত। গায়ে খুব জোরও আছে। সম্ভবত মাথায় চোট পেয়ে স্মৃতি নাশ হয়েছে।”

“কিঙ্কর নাম ? পদবি কী ?”

“কিঙ্কর সেনাপতি।”

মাধবের ভ্রূ কুঁচকে গেল, “সেনাপতি! আশ্চর্যের বিষয়, তোমার বাবা পূর্ণচন্দ্রের দরবারে একজন কুস্তিগির ছিল, তার নাম শঙ্কর সেনাপতি। তারও বিশাল চেহারা ছিল, নামডাকও ছিল খুব। এই কিঙ্কর সেই শঙ্করের কেউ হয় না তো?

বীরচন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, "তা তো জানি না।"

"লোকটা কোথায়?"

"চলুন, ওই কোণের দিকের একটা ঘরে ঘুমোচ্ছে।"

বীরচন্দ্র মাধবকে দোতলার শেষপ্রান্তে একটা ঘরে নিয়ে এল । ভেজানো দরজা ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকলেন ।

রাজবাড়ির সব জিনিসই আকারে বেশ বড় । এই কোণের ঘরটায় খাট-পালঙ্ক না থাকলেও বিশাল একখানা চৌকি আছে। অতি মজবুত শালকাঠে তৈরি । তার ওপর শতরঞ্চিতে শুয়ে বিশাল চেহারার লোকটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে । গায়ে হাতকটা গেঞ্জি আর পরনে পাজামা । বোধ হয় বিরুর দেওয়া ।

মাধব তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "মনে হচ্ছে এ শঙ্করেরই ছেলে । চেহারার আদল একই রকম।"

দুজনে ফের বৈঠকখানায় ফিরে এসে মুখোমুখি বসলেন । মাধব বললেন, "ওকে দেখে গাঁয়ের লোক এত ভয় পেল কেন, তা বুঝলাম না । চেহারাটা বিরাট ঠিকই, কিন্তু বিকট তো নয় ।"

"কিঙ্করের পোশাক তো আপনি দেখেননি, ও পরে ছিল কালো সার্টিনের ওপর জরির কাজ-করা পোশাক । অনেকটা রাজাটাজাদের মতো । তাইতেই লোকে ভড়কে গিয়ে থাকবে।"

মাধব গম্ভীর মুখে বললেন, "হুঁ, অন্ধকার রাত্রি, জরির পোশাক এবং বিরাট চেহারা । সব মিলিয়েই কাণ্ডটা ঘটেছে । এখন একে নিয়ে তুমি কী করবে?"

"আপাতত আমার কাছেই রেখে দেব, মুশকিল হচ্ছে, ছেলেটা মাঝে-মাঝে খুব চঞ্চল হয়ে উঠছে। একটা কিছু বোঝাতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। ও ঘুমিয়ে পড়ার ফলে রাতে আমি ওর মাথাটা দেখেছি। সন্দেহ ছিল মাথার চোট থেকেই স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকতে পারে । মাথার পেছন দিকটায় দেখলাম, মস্ত বড় একটা ক্ষতচিহ্ন শুকিয়ে আছে। দেখে বোঝা যায়, খুব বেশিদিন আগেকার চোট নয়, সম্প্রতিই হয়েছে।"

মাধব মাথা নেড়ে বললেন, "বুঝেছি। ওর কাছ থেকে আরও কিছু কথা বের করতে হবে । আমি একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

"সেটা আমিও পাচ্ছি। কিন্তু কীরকম বিপদ হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

মাধব একটু ভেবে বললেন, "বিপদ অনেক রকমেরই হতে পারে । এই তোমার কথাই ধরো । তুমি রাজবংশের ছেলে । রাজাগজাদের ওপর অনেকের রাগ থাকে।"

বীরচন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "সতর্ক থাকতে বলছেন?"

"থাকা ভাল । তোমার অস্ত্রশস্ত্র কী আছে ?"

"কিছুই প্রায় নেই। বন্দুক, পিস্তল যা ছিল সব সরকারকে দিয়ে দিয়েছি। দুখানা ভাল দোধারওলা বিলিতি তলোয়ার আছে । আর সামান্য কয়েকটা

ছোরাচুরি।”

“তলোয়ার চালাতে পারো?”

“আগে পারতাম। এখন ভুলে গেছি।”

“যা জানো তাতেই হবে। তোমার রক্তেই শিক্ষাটা আছে। চিন্তা কোরো না।”

বীরচন্দ্র একটু হেসে বলল, “আমি নিজের জন্য কখনওই চিন্তা করি না। অযথা ভয়ও পাই না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন সতর্ক থাকব।”

“আমি লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকলে।”

“আপত্তি কিসের? আপনি বিচক্ষণ মানুষ, হয়তো ওর কথার সূত্র ধরে কিছু অনুমান করতে পারবেন। ও যে শঙ্কর সেনাপতির ছেলে, এটা তো আমি আবিষ্কার করতে পারিনি, আপনি বসুন, আমি ওকে ডেকে আনছি।”

বীরচন্দ্র উঠে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তার পিছু-পিছু প্রকাণ্ড চেহারার কিঙ্কর এসে ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। মাধব ঘোষাল তার আপাদমস্তক ভাল করে লক্ষ করলেন। হ্যাঁ, এ কুস্তিগিরই বটে। কিন্তু ছোট-ছোট দুখানা চোখে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। কেমন একটা অস্থির, উদ্বেগাকুল চাউনি।”

মাধব হাসিমুখে বললেন, “বোসো কিঙ্কর।”

কিঙ্কর একখানা চেয়ারে বাধ্য ছেলের মতো বসল, একটু জড়োসড়ো ভাব। দিনের আলোতে লোকটাকে এত নিরীহ লাগছিল যে, এই লোকটাই কাল রাতে গাঁয়ে দৌরাত্ম্য করে বেড়িয়েছে সেটা বিশ্বাস হয় না।

মাধব তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখেই বললেন, “নবীগঞ্জে তুমি আগে কখনও এসেছ?”

কিঙ্কর একটু হতবুদ্ধির মতো বসে থেকে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, “না।”

“একসময়ে তোমার বাবা শঙ্কর সেনাপতি কিন্তু এখানে থাকত। এই রাজবাড়িতেই হাতিশালের পেছনে তার ঘর ছিল। জানো?”

কিঙ্করের চোখে কি একটু স্মৃতির ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল? একটা ঢোক গিয়ে সে বলল, “কিন্তু লোকটা কোথায়?”

“তুমি কি একটা বজ্জাত লোককে খুঁজছ?”

কিঙ্কর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দু হাত মুঠো পাকিয়ে শক্ত হয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, “তাকে পেলে আমি…”

মাধব হাসলেন, “উত্তেজিত হোয়ো না। সে হয়তো এখনও নবীগঞ্জে এসে পৌছয়নি। এখন বলো তো, লোকটা কেন নবীগঞ্জে আসছে?”

কিঙ্কর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "মারবে। কিন্তু তাকে আমি…”

মাধব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “কাকে মারবে?”

কিঙ্কর আবার ঠাণ্ডা হয়ে মাথা চুলকে একটু ভাবল । তারপর বলল, "একজনকে মারবে।"

"তোমাকে কি তার জন্যই এখানে পাঠানো হয়েছে? কে পাঠাল তোমাকে?"

কিঙ্কর হঠাৎ বলে উঠল, "বাবা।"

"তোমার বাবা শঙ্কর? সে এখন কোথায়?"

কিঙ্কর সজোরে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নেই । মেরে ফেলেছে। বন্দুক দিয়ে ।"

“বন্দুক দিয়ে?”

“দুম করে, ওঃ, কী শব্দ" বলে যেন সভয়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিল কিঙ্কর।

মাধব বললেন, “আমাদের বন্দুক নেই। ভয় পেও না।”

“ওই লোকটার আছে। দুম-দুম করে শব্দ হয়। বন্দুক খুব খারাপ জিনিস।”

“তোমাকে লোকটা কী দিয়ে মারল?”

“বন্দুক দিয়ে।" বলে কিঙ্কর একবার ডান হাতটা তুলে মাথার পেছন দিককার ক্ষতস্থানটিতে হাত বুলিয়ে নিল।

মাধব আর বীরচন্দ্র নিজেদের মধ্যে একটু দৃষ্টিবিনিময় করে নিলেন। মাধব মৃদুস্বরে বললেন, “বজ্জাত লোকটা এখানে কাকে মারতে আসবে?”

“একজনকে।”

“কয়েকটা নাম বলছি। মনে করে দ্যাখো তো, এদের মধ্যে কেউ কি না। মাধব ঘোষাল, সত্যেন রায়, পুঁটে সর্দার, হরিহর পণ্ডিত, বীরচন্দ্র রায়চৌধুরী। এদের মধ্যে কেউ?”

কিঙ্কর মাথা নেড়ে বলল, “এরা নয়। অন্য লোক।”

“নামটা মনে নেই বুঝি?”

“রা-রাজু।”

মাধব ভ্রু কুঁচকে বললেন, “রাজু! এখানে রাজু নামে আবার কে আছে? আমার নাতির নাম রাজু বটে, কিন্তু সে তো বাচ্চা ছেলে।”

কিঙ্কর হঠাৎ বলে উঠল, “আমার খিদে পাচ্ছে।”

বীরচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে গেল এবং একটু বাদেই বনমালী একখানা গামলার সাইজের রাজকীয় কাঁসার বাটিতে বিপুল পরিমাণে চিড়ে-দই আর সন্দেশের ফলার নিয়ে এল।

কিঙ্কর যে খেতে খুবই ভালবাসে, সেটা তার খাওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল। গপাগপ করে তিন মিনিটে বাকিটা শেষ করে সে একঘটি জল খেয়ে হঠাৎ বলল, “সোনা।”

মাধব একটু ঝুঁকে পড়লেন, “কিসের সোনা? কোথায় সোনা?”

“আছে। লোকটা জানে।”

মাধব একবার বীরচন্দ্রের দিকে তাকালেন। বীরচন্দ্রের মুখে কোনও ভাবান্তর নেই।

মাধব বললেন, “কিছু বুঝতে পারছ বিরু?”

“আজ্ঞে না জ্যাঠামশাই। হয়তো আবোল-তাবোল।”

“একটা ষড়যন্ত্রের আভাস বলে মনে হচ্ছে না?”

বীরচন্দ্র একটু হাসল, বলল, “আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? কিঙ্করের বুদ্ধি স্থির নেই। স্মৃতিশক্তিও কাজ করছে না। বিচ্ছিন্ন কথা থেকে কিছু তো বোঝার উপায় নেই।”

মাধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বিচ্ছিন্ন কথাগুলোকে জোড়া দিলে কিন্তু একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায় । একটা পাজি লোক শঙ্করকে খুন করেছে, কিঙ্করকে জখম করেছে । তারপর এখানে রাজু নামে কাউকে খুন করতে আসছে। রাজুর কাছে হয়তো সোনাদানাও আছে।”

বীরচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলল, “সেটা অসম্ভব নয়। তবে গাঁয়ে তো রাজু নামে কেউ নেই বলছেন?"

মাধব বললেন, “আমার চেনাজানার মধ্যে হয়তো নেই । ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।”

মাধব কিঙ্করের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছ কিঙ্কর, তুমি কী-কী খেতে ভালবাসো?”

কিঙ্কর এই প্রশ্নটা শুনে যেন খুশি হল । বলল, “লাল টেকিছটা চালের ভাত, ঘন মুগ ডাল, খাসির মাংস, পায়েস আর রসগোল্লা।”

মাধব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “কখনও-কখনও স্মৃতি বেশ কাজ করছে দেখছি । আচ্ছা, কিঙ্কর, কোন দোকানের রসগোল্লা সবচেয়ে ভাল?”

“চারু ময়রা।”

“চারু ময়রার দোকানটা কোথায়?”

“কেন, বাজারে।”

“কোথাকার বাজার?”

“রসুলপুর ।”

মাধব বীরচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, “রসুলপুর খুব একটা দূরে নয়। সেখানে আমার যজমান আছে। আজ বিকেলেই খবর পেয়ে যাব । মনে হচ্ছে ঘটনার সূত্র সেখানেই পাওয়া যাবে।”

মাধব উঠে পড়লেন। মুখে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ । বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুটো কাজ করলেন। নিমাই আর নিতাইকে পাঠালেন,

গাঁয়ে রাজু নামে কেউ আছে কিনা তা ভাল করে খুঁজে দেখতে । দ্বিতীয় কাজটা দুঃখহরণের সঙ্গে একটা গোপন সাক্ষাৎকার।

মাধবের প্রস্তাব শুনে দুঃখবাবু একটু আঁতকে উঠে বললেন, “বারো মাইল! ও বাবা, বারো মাইল দৌড়লে আমি মরেই যাব।”

মাধব প্রশান্ত মুখে বললেন, "ভূতের গাঁট্টা খেয়ে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দুঃখহরণ। কিন্তু সেটা তুমি বুঝতে পারছ না । বারো মাইল কিছুই না । এ-বেলা রসুলপুরে যাওয়ার কোনও গাড়ি নেই। এখন তুমিই ভরসা। খবরটা জরুরি কিনা।”

দুঃখবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, “আমি রোগা, দুর্বল মানুষ । আমার ওপর অনেক অত্যাচারও হচ্ছে। কাতুকুতু, সুড়সুড়ি, গাঁট্টা, কিছু আর বাকি নেই। এর ওপর আপনি বারো মাইল দৌড় করালে আমি কি আর বাঁচব?”

"খুব বাঁচবে। তুমি রোগা আর দুর্বল ছিলে বটে, কিন্তু এখন তোমার হাত-পা সবল হয়েছে, ফুসফুসের ক্ষমতা বেড়েছে, তুমি সেটা পরীক্ষা করে দ্যাখো। মনে রেখো, তুমিও একজন কুস্তিগিরের বংশধর। কুলাঙ্গার হওয়া কি ভাল?"

দুঃখবাবু রাজি হচ্ছিলেন না, বললেন, "ও আমি পারব না মশাই। আপনি অন্য লোক দেখুন।"

বলেই হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলেন দুঃখবাবু, "ওঃ, এখন আবার গাঁট্টা পড়ছে কেন? এ-সময়ে তো গাঁটা পড়ার কথা নয়। সকালে যে চার-পাঁচ মাইল দৌড়ে এলাম। উঃ, ওই আবার।"

মাধব গম্ভীর মুখে দুঃখবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "তা হলে তুমি যাবে না?"

দুঃখবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "যাচ্ছি মশাই যাচ্ছি। না গিয়ে উপায় আছে? যা দুখানা গাঁট্টা ঝেড়েছে যে, মাথা ঝিমঝিম করছে। তা কিসের খবর আনতে হবে? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।"

মাধব বললেন, "রসুলপুরে শঙ্কর সেনাপতির খোঁজ কোরো। তার একটা ছেলে আছে, নাম কিঙ্কর, তাদের সব খবর আমার চাই। তাদের সম্পর্কে কোনও গুজব থাকলে তাও শুনে এসো।"

দুঃখবাবু দৌড় শুরু করে দৌড়তে-দৌড়তেই বললেন, "ঠিক আছে মশাই, ঠিক আছে। আমার আর দাঁড়ানোর উপায় নেই। শিলাবৃষ্টির মতো গাঁট্টা পড়তে লেগেছে।"

মুহূর্তের মধ্যে দুঃখবাবু হাওয়া হয়ে গেলেন। মাধব বাড়ি ফিরে বাগানে একটা গাছের ছায়ায় বসে গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগলেন। শঙ্কর সেনাপতিকে তিনি চিনতেন। খুবই ডাকাবুকো লোক। রাজা পূর্ণচন্দ্রের আমলেই রাজবাড়ির সুদিন শেষ হয়ে যায়। সরকারের ঘরে বিস্তর দেনা জমে গিয়েছিল। সেসব মেটাতে গিয়ে পূর্ণচন্দ্র সর্বস্বান্ত হন। পোষ্যদের বিদায় করে দিতে হয়। দাসদাসীদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর আর ছিল না। রাজবাড়ি সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ছিল, তা সারানোর ক্ষমতাও তাঁর তখন নেই। বসতবাড়ি আর সামান্য দেবত্র সম্পত্তি ছাড়া সবই ক্রোক হয়ে যাওয়ার পর রাজবাড়ি একেবারে ভূতের বাড়ির মতো হয়ে গেল। পূর্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর নাবালক বীরচন্দ্রকে ঠকিয়ে আমলা কর্মচারী এবং আত্মীয়রা অস্থাবর যা কিছু ছিল সব হাত করে নেয়। সেটা তো ইতিহাস। কিন্তু শঙ্কর সেনাপতির কী হল তা মাধব জানেন না। রাজুটাই বা কে? কিঙ্করের অসংলগ্ন কথাবার্তাকেই বা কতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? কিঙ্কর যদি পাগল হত, তা হলে মাধব গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু কিঙ্কর পাগল নয়, স্মৃতিভ্রষ্ট মাত্র। তা ছাড়া শঙ্কর সেনাপতির ছেলে। মাধবের মনটা কুডাক ডাকছে।

দুঃখবাবু দৌড়ে যখন রসুলপুর পৌঁছলেন তখন বেলা সাড়ে দশটার বেশি হয়নি। তিনি হাফিয়ে পড়লেও নেতিয়ে পড়েননি। ধুতির খুঁটে ঘাড়-গলার ঘাম মুছে একটু জিরিয়ে নিলেন। গাঁট্টি বন্ধ হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। রসুলপুর বড় একখানা গঞ্জ। মেলা দোকানপাট, বাড়িঘর, বহু মানুষের বাস। বাজারটাও

বেশ বড়। চারু ময়রার মিষ্টির দোকানে বসে দুঃখবাবু গোটাদশেক গরম বড়-বড় রসগোল্লা খেলেন। তারপর দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ মশাই, এখানে শঙ্কর সেনাপতির বাড়িটা কোনদিকে বলতে পারেন?"

দোকানি মুখখানা তোম্বা করে বলল, "শঙ্কর সেনাপতি! তাকে আর খুঁজে কী হবে? তাকে তো কয়েকটা গুণ্ডা এসে নিকেশ করে গেছে।"

দুঃখবাবু অবাক হয়ে বলেন, "খুন নাকি?"

"খুন বলে খুন? একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে। ছেলেটাও মরছিল। তবে বরাতজোরে প্রাণটা রক্ষে হয়েছে। এই তো সবে পরশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কোথায় চলে গেছে যেন।"

"বাড়িতে আর কেউ নেই?"

"না। বাপ-ব্যাটায় থাকত। কুস্তিটুস্তি করে বেশ নাম হয়েছিল কিঙ্করের। এমনিতে নিরীহ মানুষ ছিল তারা। কেন হামলা হল কেউ জানে না।"

"খুনি ধরা পড়েনি?"

"না মশাই। গভীর রাতে এসে কাজ সেরে পালিয়ে গেছে।"

"তাদের খবর কোথায় পাই বলতে পারেন?"

"খুনির খবর খুঁজছেন?"

দুঃখবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "না-না। আমি বাপ-ব্যাটার খবর নিতেই এসেছি।"

"খবর ওইটুকুই।"

দোকানের একটা বেঞ্চে বসে একটা লোক ঘাপটি মেরে কথা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "শঙ্করের কাছে একখানা খবর ছিল। সেই খবর চেপে রেখেছিল এতদিন। সেইজন্যই তো বেঘোরে প্রাণটা গেল।"

দুঃখবাবু বললেন, "কিসের খবর?"

"তা অত জানি না। পাঁচজন পাঁচ কথা বলে।"

"সেই কথাগুলো একটু শুনতে পাই?"

"তা পান। তবে এককাপ চা খাওয়াতে হবে।"

দুঃখবাবুর দুঃখের শেষ নেই। বললেন, "খাওয়াব। বলুন।"

"শঙ্কর কোনও এক রাজবাড়িতে মাইনে-করা কুস্তিগির ছিল বলে শোনা যায়। তা সেই রাজবাড়ির কোনও গুপ্ত খবর সে জেনে ফেলে। কিসের খবর তা আমি বলতে পারব না। তবে লুকনো খবরই হবে। গুণ্ডাগুলো অনেকদিন ধরেই নাকি তাকে শাসচ্ছিল।"

"ও বাবা! এ যে সাঙঘাতিক কাণ্ড!"

"খুবই সাঙ্ঘাতিক। চারদিকেই সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক সব কাণ্ড হচ্ছে, আজকাল আর কারও প্রাণের কোনও দাম নেই। চায়ের দামটা দিয়ে দেবেন কিন্তু। আজ চলি। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, তা আপনার কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?"

"আজ্ঞে নবীগঞ্জ।"

“নবীগঞ্জ ? বাঃ, বেশ । নবীগঞ্জ ভাল জায়গা । জলহাওয়া ভাল, ঝুটঝামেলা নেই । ”

দুঃখবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, “ভাল জায়গা ? হুঁঃ, ভাল জায়গার নিকুচি করেছে। অতি যাচ্ছেতাই জায়গা মশাই ।

দোকানির কাছে হদিস জেনে নিয়ে দুঃখবাবু শঙ্কর সেনাপতির বাড়িটাও দেখলেন । গঞ্জের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে একখানা ছোট বাড়ি । সামনের বাগানে একটা কুস্তির আখড়া । বাড়িটা তালা-দেওয়া হলেও আখড়ায় কয়েকজন কুস্তি প্রাকটিস করছিল । দুঃখবাবু কুস্তি টুস্তি পছন্দ করেন না। তবু পায়ে-পায়ে ভেতরে ঢুকে একপাশে দাঁড়িয়ে কুস্তি দেখতে লাগলেন । কেউ তাঁকে বিশেষ লক্ষ করল না। খানিকক্ষণ কুস্তি দেখার পর জিনিসটা তাঁর বেশ ভাল লাগতে লাগল । উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন । একজন পালোয়ান আর-একজন পালোয়ানকে কাবু করেও সামান্য ভুলের জন্য হারাতে পারছিল না দেখে দুঃখবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, “আরে বাঁ পায়ে লেঙ্গি মারুন না । ডান পায়ে ভর দিন, তারপর..”

আশ্চর্যের বিষয়, পালোয়ানটা তাই করল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিত করে উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখবাবুর দিকে চেয়ে বলল, “আপনি তো ওস্তাদ লোক মশাই! আসুন, ল্যাঙটা পরে নিয়ে নেমে পড়ুন তো ! আমাদের শেখানোর কেউ নেই। শঙ্কর ওস্তাদ খুন হওয়ার পর থেকে আমাদের কিছু হচ্ছে না। আপনি নেমে পড়ুন তো "

দুঃখহরণবাবু সভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “পাগল নাকি ? আমি তো ফুঁয়ে উড়ে যাব।”

যারা চারধারে বসে কুস্তি দেখছিল, মাটিমাথা শরীরে সেইসব ছেলে-ছোকরা হঠাৎ উঠে হইচই করে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল । বলল, “আপনি ওস্তাদ লোক, দেখেই বুঝেছি। আপনাকে ছাড়ছি না । ”

একরকম জোর করেই তাঁকে তারা ল্যাঙট পরতে বাধ্য করল । দুঃখবাবু কাঁপতে-কাঁপতে আখড়ায় নামলেন । কুস্তির ক-ও তিনি জানেন না । কিন্তু উপায় কী ? মাধব ঘোষালের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে না প্রাণটা যায় !

কুস্তি করতে এল নিতান্ত ছোকরা এক কুস্তিগির। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা । তার দুখানা হাত যেন সাঁড়াশির মতো এসে জাপটে ধরল দুঃখবাবুকে । তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। তবে আত্মরক্ষার তাগিদে আকুপাঁকুও করতে লাগলেন । হঠাৎ মাথায় খটাং করে একটা গাঁট্টা এসে লাগল । কে যেন কানে-কানে বলল, “বাঁ হাতটা তুলে ওর ঘাড়টা ধর । অন্য হাত দিয়ে থুতনির তলায় চেপে উলটে দে । ”

দুঃখবাবু তাই করলেন । এবং ছেলেটা পটাং করে তাঁকে ছেড়ে উলটে পড়ে গেল । চারদিকে সপ্রশংস হর্ষধ্বনি উঠল, “হ্যাঁ, ওস্তাদ বটে । ”

দুঃখবাবু হাঁফাতে-হাঁফাতে পালানোর পথ খুঁজছিলেন । কিন্তু পালাবেন কি ! সবাই একেবারে ঘিরে ধরেছে তাঁকে ।

পালানোর উপায় নেই। ফলে আবার একজনের সঙ্গে কুস্তি করতে হল দুঃখবাবুকে । এবার কেউ কানে-কানে প্যাঁচ মারার কায়দা শেখাল না । দুঃখবাবু নিজেই একটা পাঁচ আবিষ্কার করে দ্বিতীয় জনকেও হারিয়ে দিয়ে খুবই অবাক হয়ে গেলেন ।

চারদিকে একটা হইহই পড়ে গেল । দুঃখবাবু আর তেমন দুঃখ-দুঃখ ভাবটা টের পাচ্ছিলেন না । আজ তাঁর ঘাড়ে একটা কিছুর ভর হয়ে থাকবে । তিনি তিন নম্বর লড়াইতেও ভালই লড়লেন এবং জিতে গেলেন । অথচ এই কুস্তিগিরদের হাতে তাঁর মারা যাওয়ার কথা ।

কুস্তির আসরটা একসময়ে শেষ হল । দুঃখবাবুকে মাঝখানে রেখে সবাই ঘিরে বসল তাঁকে । একজন বলল, "এতদিন কোথায় ছিলেন ওস্তাদ ? আপনাকে পেলে আমাদের আর শঙ্কর ওস্তাদের কথা মনেই থাকবে না । "

দুঃখবাবু শঙ্কর সেনাপতির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন । নামটা শুনে মনে পড়ল । বললেন, "দ্যাখো ভাই, আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি। শঙ্কর সেনাপতি কীভাবে খুন হল, তা কেউ জানো ?"

একজন বলল, "খুনটা হয়েছে মাঝরাতে । কেউ তখন জেগে ছিল না । বন্দুকের শব্দে যখন পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিঙ্করের মাথায় চোট হয়েছিল । তাকে হাসপাতালে আমরাই নিয়ে যাই । তবে সে বেঁচে গেছে । "

"সে এখন কোথায় ?"

"তা কেউ জানে না। পরশুদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই সে কোথায় যেন চলে গেছে । তবে হাসপাতালে যে নার্স তার দেখাশোনা করত সে বলেছে কিঙ্কর নাকি বিকারের ঘোরে একটা রাজবাড়ির কথা বলত । "

"তোমরা আর কেউ কিছু জানো না ?"

একজন বলে উঠল, "আমি জানি। শঙ্কর ওস্তাদের কাছে মাসখানেক যাবৎ একটা লোক আনাগোনা করছিল । সেই লোকটা যাতায়াত শুরু করার পর থেকেই ওস্তাদের একটা ভাবান্তর লক্ষ করতাম । কেমন যেন গম্ভীর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত । একদিন আমাকে ডেকে বলল, 'ওরে, আমি হঠাৎ মারা পড়লে তোরা কেউ একজনকে একটা খবর দিতে পারবি ? আমি বললাম, হঠাৎ মারা যাওয়ার কী হল ? ওস্তাদ বলল, "কারণ আছে বলেই বলছি । গতিক সুবিধের নয়। আমার পেছনে লোক লেগেছে।"

আর-একটা ছেলে বলে উঠল, "ওস্তাদ আমাকেও একদিন বলেছিল, কারা যেন একটা গুপ্ত খবরের জন্য তাকে ভয় দেখাচ্ছে । "

আগের ছেলেটাকে দুঃখবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যে-লোকটা যাতায়াত করত তার চেহারা কেমন?"

"লম্বাচওড়া, কালো চেহারা। খুব ভয়ঙ্কর দুখানা চোখ । "

"নাম জানো ?"

"না। তাকে একদিনই দেখেছিলাম। দেখলেই ভয় হয়।"

দুঃখবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, "আমাকে নবীগঞ্জে ফিরতে হবে। তোমাদের সঙ্গে মিশে আমার বড় ভাল লাগল।"

"আবার কবে আসবেন?"

"কালই হয়তো আসব। রোজই আসতে পারি।"

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। দুঃখবাবু ফেরার পথে দৌড়তে-দৌড়তে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন। মনে ভারী আনন্দ।

মাধব ঘোষাল দুঃখবাবুর সব কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং খুশি হয়ে বললেন, "এই তো চাই। তোমাকে কুলাঙ্গার বলে ভাবতাম। এখন দেখছি তুমি মোটেই তা নও।"

দুঃখবাবু একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "সবই তো হল ঘোষালমশাই, এখন এই ভুতুড়ে গাঁট্টার একটা বিহিত হওয়া দরকার।"

মাধব ঘোষাল শশব্যস্তে বললেন, "তাড়া কিসের? ওটা চলছে চলুক না। আমি তো লক্ষণ ভালই দেখছি।"

দুঃখবাবু বিদায় নিলে মাধব ঘোষাল ঘটনার টুকরোগুলোকে ফের মনে-মনে সাজাতে শুরু করলেন। জিগ শ পাজলের মতো ভগ্নাংশ জুড়ে ছবিটা যদি পুরো করা যায়।

নিমাই আর নিতাই গোটা নবীগঞ্জ আর আশপাশের গাঁ ঘুরে এসে জানাল, "আমরা বারোজন রাজু পেয়েছি। কিন্তু কারও বিশেষ সোনাদানা নেই। শুধু খিজিরপুরের রাজু ব্যাপারির পয়সা আছে। তার তামাকের ব্যবসা। বুড়ো মানুষ।"

মাধবের রাজু ব্যাপারিকে পছন্দ হল না। তিনি বললেন, "আরও খোঁজো। অনেকের হয়তো পোশাকি নাম রাজু নয়, ডাকনাম রাজু। এসবও খুঁজে বের করতে হবে।"

"যে আজ্ঞে।" বলে দুই বন্ধু চলে গেল। মাধব রাজুকে নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কোনও কুলকিনারা পেলেন না। বিকেলের দিকে তিনি ফের রাজবাড়ি রওনা হলেন। কিঙ্করের সঙ্গে আরও কথা হওয়া দরকার।

গিয়ে দেখলেন,কিঙ্কর রাজবাড়ির দোতালার বারান্দায় ডন-বৈঠক করছে। বীরচন্দ্র দাঁড়িয়ে দেখছে।

মাধবকে দেখে বীরচন্দ্র এগিয়ে এসে বলল, "কোনও খবর আছে?"

"ওকে ডন-বৈঠক করাচ্ছ নাকি?"

বীরচন্দ্র হেসে বলল, "করাচ্ছি। মনে হচ্ছে এসব করলে ও স্বাভাবিক থাকবে। ডন-বৈঠক করার অভ্যাস তো?"

"তা বটে। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

মাধব ঘরে বসলেন। একটু বাদে বীরচন্দ্র ঘমাক্ত কিঙ্করকে নিয়ে এল।

সস্নেহে মাধব বললেন, "বোসো কিঙ্কর।"

কিঙ্কর বসল।

মাধব তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে বললেন, "লোকট কালো, লম্বা আর খুব স্বাস্থ্যবান। না?"

কিঙ্কর কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, "কোথায় সে ?"

মাধব তাড়াতাড়ি বললেন, "বোসো, বোসো। উত্তেজিত হোয়ো না। সে এখনও এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু চেহারাটা তোমার মনে পড়ছে তো !"

কিঙ্কর ফের বসল এবং ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভেবে বলল,"হারিয়ে যাচ্ছে।"

"কী হারিয়ে যাচ্ছে ?"

"চেহারাটা।"

"ভাল করে ভাবো। লম্বা, জোয়ান, দুখানা ভয়ঙ্কর চোখ।"

একটু শিউরে উঠে কিঙ্কর বলল, "খুব ভয়ঙ্কর।"

"মনে পড়ছে ?"

"চোখ দুখানা ভয়ঙ্কর।"

"আর কিছু ?"

"আর বন্দুক। দুম।"

"তার একটা দল আছে না ?"

কিঙ্কর একটু ভেবে বলল, "আছে।"

"এখন বলো তো, শঙ্কর মারা যাওয়ার আগে তোমাকে কী বলে গিয়েছিল!"

কিঙ্কর একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "বলেছিল, 'সাবধান !
সাবধান' ?"

"আর কিছু নয় ?" কিঙ্কর কপালে আঙুল চেপে মনে করার চেষ্টা করতে-করতে বলল, "বলেছিল, 'সাবধান ! সাবধান ! নবীগঞ্জে যাও। রা-রাজুকে বোলো ওরা আসছে।"

"রাজুকে তুমি চেনো ?"

কিঙ্কর মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"তুমি তো তোতলা নও, তবে রাজু উচ্চারণ করার সময় রা-রাজু বলছ কেন ?"

কিঙ্কর চেয়ে রইল, কিন্তু কিছু বলল না।

বীরচন্দ্র বলল, "জ্যাঠামশাই, আপনি বড্ড উদ্বিগ্ন হচ্ছেন এত ভয় পাওয়ার হয়তো কিছুই নেই। শেষ অবধি হয়তো পর্বতের মূষিক প্রসব হবে।"

"তাই যেন হয়। তবে সাবধানের মার নেই। সমস্যা হচ্ছে রাজু| কে এই রাজু তা বুঝতে পারছি না।"

কিঙ্কর হঠাৎ বলে উঠল, "রাজু একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকে।"

মাধব আবার ঝুঁকে বললেন, "উচু জায়গা ? কীরকম উঁচু জায়গা ?"

“তা জানি না।”

“পাহাড় ? টিলা ?”

“ভুলে গেছি।”

মাধব আর-একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বনমালী এসে খবর দিল, রায়বাবু দেখা করতে এসেছেন।

মাধব ভ্রু কুঁচকে বীরচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, “রায়বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে নাকি?”

বীরচন্দ্র বলল, “না, ঠিক আলাপ নেই। তবে মাসদুয়েক আগে আর-একবার উনি এসেছিলেন। কুশল প্রশ্ন করে গিয়েছিলেন।”

বীরচন্দ্র কিঙ্করকে কোণের ঘরে রেখে এল। তারপর বনমালীকে বলল, “নীচের বৈঠকখানায় বসাও। আমি যাচ্ছি।”

মাধব বললেন, “তুমি একাই যাও। আমি যে এখানে আছি তা বলার দরকার নেই।”

“তাই হবে।” বলে বীরচন্দ্র চলে গেল।

রায়বাবু খুবই অমায়িক মানুষ। বীরচন্দ্র বৈঠকখানায় ঢুকতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

বীরচন্দ্র লজ্জা পেয়ে বলল, “আপনি উঠলেন কেন ? বসুন।”

রায়বাবু হাতজোড় করে বললেন, “মানীর মান রক্ষা করতে হবে না ? বয়সে ছেলেমানুষ হলে কী হয়, আপনি যে রাজা তা ভুলি কী করে ?”

বীরচন্দ্র হেসে ফেলল।

রায়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “মরা হাতি লাখ টাকা।”

মুখোমুখি বসে বীরচন্দ্র বলল, “রাজাদের দিন চলে গেছে। আমি আর রাজাটাজা নই।”

রায়বাবু একটু হেসে বললেন, “সে তো আপনি বলবেনই। তবে শুনেছি রাজদর্শনে পুণ্য হয়। তা শরীরগতিক সব ভাল তো ?”

“ভালই।”

“এদিকে গাঁয়ে যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, সে-বিষয়ে আপনি কিছু শুনেছেন ?”

বীরচন্দ্র অবাক হয়ে বলে, “কিসের আতঙ্ক ?”

“আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু নবীগঞ্জের অনেকেই তাকে কাল রাতে দেখেছে। দৈত্য বা রাক্ষস কিছু একটা। দৈত্য বা রাক্ষসের অস্তিত্ব নেই, জানি। কিন্তু এত লোকে যখন বলছে তখন কিছু একটা হবেই। আপনি কিছু শোনেননি ?”

বীরচন্দ্র একটু হাসল। বলল, “শুনেছি। তবে গুরুত্ব দিইনি।”

“তাকে কিন্তু আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুবই আশ্চর্যের বিষয় নয় ?”

"হয়তো পালিয়ে গেছে।"

রায়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "পালিয়ে গেছে ! কিন্তু সে যে একজনকে খুঁজতে এসেছিল । যাকে খুঁজছে তাকে খুন করতেই এসেছে সে। কিন্তু তার চেহারা কেমন, নাম কী, কিছু বলতে চাইছে না । ব্যাপারটা খুবই ভয়ের হয়ে দাঁড়াল। কাকে খুনটুন করে বসে তার ঠিক কী ?"

বীরচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বলল, "শুনেছি গাঁয়ে আজ রাত থেকে পাহারা দেওয়া হবে। সবাই সতর্ক থাকলে তত ভয়ের কিছু নেই।"

"আমি একটু ঘাবড়ে গেছি। কাল রাতে আমার বাড়িতে কেউ এসেছিল । আমার কুকুরকে ওষুধমেশানো মাংস খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চুরির চেষ্টা করেছিল । বাগানে খুব ভারী আওয়াজও শুনেছি। ভাবছি ক'দিনের জন্য নবীগঞ্জ ছেড়ে বাইরে গিয়ে থেকে আসব|"

বীরচন্দ্র হাসল। বলল, "সেটাও একটা সমাধান বটে। "

রায়বাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "রাজবাড়িতে কি চোরটোর হানা দেয় না ?"

বীরচন্দ্র ঠোঁট উলটে বলল, "দেয় হয়তো। তবে রাজবাড়িতে তো কিছু নেই। সবাই জানে।"

"তবু আপনার সতর্ক থাকা ভাল। সেই রাক্ষসটাই যদি হানা দেয় তা হলে কী করবেন ?"

"তা তো জানি না|"

"অনেকে বলে, আপনি নাকি গভীর রাতে বীণা বাজান। এ-কথা কি সত্যি ?"

লাজুক বীরচন্দ্র মুখ নামিয়ে হেসে বলল, "ওইটেই আমার সময় কাটানোর উপায়।"

"ভাল। কিন্তু অত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয়। একটু সতর্ক থাকবেন|"

রায়বাবু তাঁর রুপোবাঁধানো লাঠিটা তুলে পাশের একটা বন্ধ দরজার দিকে নির্দেশ করে বললেন, "ওটা কিসের ঘর বলুন তো ?"

বীরচন্দ্র লজ্জায় একটু লাল হয়ে বললেন, "ওটা একসময়ে দরবার ছিল।"

"দরবার। বাঃ, বেশ। তা সিংহাসন-টন নেই এখন ?"

বীরচন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, "না। অনেকদিন আগেই সব বিক্রি হয়ে গেছে।"

"ঘরটা তালাবন্ধ থাকে বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ। তবে খোলা রাখলেও ক্ষতি নেই। ইঁদুরবাদুড় ঢুকবে বলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।"

"অ।" বলে রায়বাবু উঠে পড়লেন।

****

রাত দশটার ট্রেনটা আজ স্টেশনে ঢোকার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল । তারপর হুইসেল মারতে লাগল কুক-কুক-কুউক, কুক-কুক-কুউক। ভজনলাল বিরক্ত হল

। কেউ চেন টেনে ট্রেন থামিয়েছে। ওদিকে ঘরে তার ডাল-রুটি আর ট্যাড়সের তরকারি ঠাণ্ডা হচ্ছে। খিদেও পেয়েছে খুব। ট্রেনটা পাস না করিয়ে ঘরে যায় কী করে ভজনলাল?

সুতরাং ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হল ভজনলালকে। চেন টানলে অনেক বখেরা। গার্ডসাহেব নামবেন, প্রত্যেকটা কামরার ছাদের কাছে ফিট করা অ্যালার্ম সিগন্যালের ডাঁটিটা বেরিয়ে আছে কিনা
দেখবেন, সম্ভব হলে অপরাধীকে ধরে ফাইন করবেন, তারপর ডাঁটিটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে তবে ট্রেন চলবে। খিদের মুখে দেরিটা সহ্য হচ্ছিল না ভজনলালের। কিন্তু কী আর করা! সে একটা বেঞ্চে বসে দেহাতি গান গাইতে লাগল, 'রামভজন করো জ্ঞানী, রামভজন করো ধ্যানী, রামভজন করো প্রাণী, দো দিন কা জিন্দাগানি...'

হুইসেল মেরে ট্রেনটা অবশেষে চলল এবং বিস্তর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। ড্রাইভার রামসেবক তেওয়ারি বন্ধু লোক। লাইন ক্লিয়ারটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভজনলাল জিজ্ঞেস করল,"ক্যা ভৈল হো রামভাই?"

রামসেবক জবাব দিল, "দশ-বারা বদমাশ উঠা থা টিরেন মে| চেন খিঁচকে জঙ্গলমে উতার গয়া। ডাকু-উকু মালুম হোতা।"

ভজনলাল উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "আরে রামভাই, ইয়ে তো খতরনাক জায়গা ভৈল বা। কাল ভি এক বদমাশ আয়া থা।
আজ বারা বদমাশ?"

নাঃ, ভজনলালকে ভাবিত হতেই হচ্ছে। ট্রেনটা পাস করিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে রুটি খেয়ে মোটা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একবার মাধব ঘোষালের কাছে যাওয়া দরকার। স্টেশনে নতুন কোনও লোক নামলে খবরটা দিতে বলেছেন মাধব।

ওদিকে নবীগঞ্জে রাত-পাহারা শুরু হয়েছে। নবীগঞ্জ বড় জায়গা। অনেকটা ছড়ানো এলাকার সবটা পাহারা দেওয়ার মতো লোক পাওয়া যায়নি। দুটো ব্যাচ হয়েছে। আজ এক ব্যাচ পাহারা দেবে, কাল আর-এক ব্যাচ। সবাই না ঘুমিয়ে পাহারা দিলে দুদিনেই সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তাই এই ব্যবস্থা। ব্যাচ ভাগ হওয়ায় পাহারা দেওয়ার লোকও অর্ধেক হয়ে গেছে। চারজন-চারজন করে ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাধব বলে দিয়েছেন, সাড়াশব্দ করা চলবে না। সবাই যেন গা-ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। দুঃখবাবুর ওপর ভার পড়েছে, দৌড়ে-দৌড়ে প্রত্যেকটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার এবং মাঝে-মাঝে এসে মাধবকে খবর দিয়ে যাওয়ার। এই প্রস্তাবে দুঃখবাবু দুঃখিত হননি। দৌড়তে তাঁর ভালই লাগছে। বেশ চাঙ্গা বোধ করছেন। রসুলপুরে আজ সকালে কুস্তি লড়ার পর তাঁর জীবনে যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। তার চেয়েও বড় কথা, গাঁট্টা, কাতুকুতু ইত্যাদি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। গাঁট্টার ভয়ে নয়, এখন তিনি মনের আনন্দেই সারা নবীগঞ্জ দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। জীবনে

খেলাধুলো করেননি, আজ রাতে দৌড়তে দৌড়তে কাবাডি খেলুড়ের মতো চু-কিত-কিত-কিত-কিত করতে-করতে একবার রাজবাড়ির ফটকের পাশের ঝোপে লুকনো বাসব দত্ত বা নিমাই আর নিতাইকে ছুয়ে আসছেন, কখনও বোসপাড়ার মোড়ে নেতাজির স্ট্যাচুর পেছনে ঘাপটি মেরে থাকা নয়ন বোস আর হরিহর পণ্ডিতকে ছুঁয়ে আসছেন, কখনও-বা হাটখোলায় বস্তাচাপা দেওয়া হাবু ঘোষ আর পুঁটে সর্দারের পিঠে চাপড় মেরে আসছেন, কখনও-বা চণ্ডীমণ্ডপের কলাঝাড়ের পেছনে গা-ঢাকা দেওয়া ব্যায়ামবীর ভল্লনাথ আর হরেন চৌধুরীকে চিমটি কেটে আসছেন। মনে আজ তাঁর ভারী আনন্দ।

নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হন্তদন্ত হয়ে পয়েন্টসম্যান ভজনলাল যখন এসে বারোজন ডাকুর খবর দিল, তখন মাধব সচকিত হলেন। বললেন, "এসে গেছে ?"

"আ গিয়া নেহি, ঘুস গিয়া, ডাকুলোগ সব ঘুসিয়ে পড়েছে।

ডাল-রুটি সেবা করতে আমার কুছু সোময় লেগেছিল, উসি সময় ডাকুলোক ঘুসিয়ে পড়েছে।"

ওদিকে রাজবাড়িতে দোতলার ঘরে কিঙ্কর চেয়ারে বসে শুনছে আর বিছানায় বসে বিভোর হয়ে বীরচন্দ্র বীণা বাজাচ্ছে। কিঙ্করের চোখে একটা মুগ্ধতা লক্ষ করছে বীরচন্দ্র। বীণা কি ওর স্মৃতিশক্তির ওপর কাজ করবে ? কে জানে।

একটা রাগ শেষ হতেই কিঙ্কর হঠাৎ বলে উঠল, "বীণা খুব ভাল জিনিস।"

"হাঁ। খুব ভাল। অভাব-কষ্ট সব ভুলে যাওয়া যায়।"

কিঙ্কর হঠাৎ বলল, "বাবা কিন্তু ওদের বলেনি।"

"কী বলেনি ?"

"যে-কথাটা ওরা জানতে চেয়েছিল।"

"কোন কথা বলো তো ?"

কিঙ্কর মাথা নেড়ে বলল, "তা, জানি না।"

বীরচন্দ্র একটু হেসে বলল, "রাজু একটা উঁচু জায়গায় বসে থাকে, এই কথা তো ?"

কিঙ্কর সবেগে মাথা নেড়ে বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাবা বলেনি।"

বীরচন্দ্র হেসে বলল, "বললেই বা কী ক্ষতি হত বলো ? আমরা রাজুকেও চিনি না, তার উঁচু জায়গা কোথায় তাও জানি না। ওসব কথা থাক। বীণা বাজাই, শোনো।"

কিঙ্কর ফের মন দিয়ে শুনল। বীণা থামতেই বলল, "ওরা রাজুকে খুন করবে। ওরা খারাপ।"

ওদিকে দুঃখবাবু হাটখোলায় বস্তাচাপা দেওয়া হাবু ঘোষকে একটা চাপড় মেরেই ফের ছুটতে যাচ্ছেন, সামনে চারজন লোক পথ থেকে সাঁত করে সরে যাচ্ছিল। দুঃখবাবু চু-কিত-কিত-কিত-কিত করতে-করতে তাদের দুজনকে ছুয়ে

ফেললেন । তারপর বললেন, “সজাগ থেকো, সজাগ থেকে । ভাল করে পাহারা দাও । ঘুরে বেড়িও না । ”

বলেই আবার চু-কিত-কিত-কিত-কিত করে ছুটতে শুরু করলেন । খানিকদূর গিয়েই তাঁর হঠাৎ মনে হল, আরে । তিনি কাদের ছুয়ে এলেন ? অন্ধকারেও তিনি যাদের দেখেছেন তারা কি নবীগঞ্জের মানুষ ? মনে হতেই দুঃখবাবু পট করে ঘুরে হাটখোলার দিকে ফিরে এলেন । কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না ।

“হাবু, হাবু!”

হাবু কম্পিত গলায় বলল, “কী বলছ ?”

“কিছু দেখেছ ?”

“খুব দেখেছি। দেখে ভয়ে হিম হয়ে আছি। ”

“সর্বনাশ !” বলে ফের ছুটতে লাগলেন দুঃখবাবু।

“ঘোষালমশাই, তারা ঢুকে পড়েছে। ”

“জানি । কোনদিকে যায় একটু বুঝতে চেষ্টা করো । তারা রাজু নামে কাউকে খুঁজছে। রাজুটা যে কে, তা তো বুঝতে পারছি না । ওদের ওপর নজর রাখো । ”

“যে আজ্ঞে ।” বলে দুঃখবাবু দৌড় শুরু করে দিলেন ।

কলাঝাড়ের পেছনে ভল্লনাথ হঠাৎ হরেন চৌধুরীকে চাপাস্বরে বলল, “ও মশাই, চিমটি কাটছেন কেন ?”

“কে চিমটি কাটছে ? কী যে বলো না, কিছু ঠিক নেই।”

“এই তো কাটলেন !”

“তোমার মাথাটাই গেছে । ”

“তবে কে কাটল ?” বলে ভল্লনাথ পেছনে ঘাড় ঘুরিয়েই হঠাৎ “বাপরে' বলে দিগ্বিদিকভ্রানশূন্য হয়ে দৌড়তে গেল, কিন্তু পারল না ! কাটা কলাগাছের একটা গোড়ায় হোচট খেয়ে পড়ে গিয়ে তার দাঁতকপাটি লাগল। হরেন চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ঘাড় ঘোরাতে যাচ্ছিলেন । কিন্তু তার আর দরকার হল না । মাথায় ঠঙাস করে কী একটা বস্তু এসে লাগতেই মুর্ছা হয়ে গড়িয়ে পড়লেন ।

ঝোপের আড়াল থেকে দুটো ছায়ামূর্তির মতো লোক বেরিয়ে এল। একজন ভারী গলায় বলল, “পাহারা দিচ্ছিল । হুঁঃ, খুব পাহারাদার । ”

অন্যজন পা দিয়ে ভল্লনাথকে একটু নেড়েচেড়ে বলল, “এটা বোধ হয় ব্যায়ামবীর, দেব নাকি গলার নলিটা কেটে ?”

“দুর, মশামাছি মেরে কী হবে? আমাদের দরকার কিঙ্কর জাম্বুবানটাকে । তাকে না পেলে এত পরিশ্রমই বৃথা । ”

“রাজবাড়িটা কোথায় ?”

“এসে গেছি, চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়ে দক্ষিণে । ’ বলে লোকটা একটা শিস দিল । সঙ্গে-সঙ্গে পালটা কয়েকটা শিস শোনা গেল ।

নেতাজির মূর্তির চারধারে তখন একটা গোল্লাছুট খেলা চলছে । নয়ন বোস প্রাণভয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, পেছনে মুগুর হাতে একটা লোক । মুগুরের ঘায়ে

আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে হরিহর পণ্ডিত। নয়নের কপাল খারাপ। হরিহর পণ্ডিতকে ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে বেশ দৌড়চ্ছিল এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ তার গায়েই হোচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। গদাম করে মুগুরটা এসে লাগল মাথায়। নয়ন বোস চোখে সর্ষেফুল দেখতে-দেখতে অজ্ঞান হয়ে গেল। হাটখোলার অবস্থা আরও খারাপ। বস্তাচাপা হাবু ঘোষ হঠাৎ নাকে ধুলো ঢুকে হেঁচে ফেলার পর একটা লোক ছুটে এসে একখানা খেটে লাঠি দিয়ে বস্তাগুলোকে আচ্ছা করে পিটে দিয়ে গেল। দুটো বস্তাই আলুর বস্তার মতো নিথর হয়ে পড়ে রইল।

নিমাই, নিতাই আর বাসব দত্ত রাজবাড়ির ফটকের মস্ত থামটার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে, একটু পেছনে পাঁচু ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ পাঁচু একটু উৎকর্ণ হয়ে কী-একটু শুনে চাপা গলায়
বলল, "এসে গেছে!"

বাসব বলল, "কে এসেছে?"

"তেনারা, শিস দেওয়ার শব্দ শুনলেন না?"

"শিস দেবে কেন?"

"ওটা ইশারা।"

"তা হলে এখন কী করব?"

"বন্দুকটা ফোটান। বন্দুক ফোটালে ভয় পেতে পারে।"

বাসব নিজেই ঠকঠক করে কাঁপছে। বন্দুকটা তুলে কোনওরকমে আকাশমুখো করে ঘোড়াটা টিপতে যাবে, ঠিক এমন সময় একটা আধলা ইট এসে কপালে লাগল। বাসব দত্ত তার বন্দুকসমেত শুয়ে পড়ল ঘাসে। বন্দুকটাকে একেবারে পাশবালিশের মতো জড়িয়ে ধরে। প্রথম লাঠির চোটেই "বাপ রে" বলে বসে পড়ল নিমাই। তারপর বাসব দত্তর পাশেই গড়িয়ে পড়ল নিতাই কিছুক্ষণ মুগুরপেটাই হয়েও দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর কাটা কলাগাছের মতো বাসব দত্তের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

লোকগুলো খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিপাটে পড়ে-থাকা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে ছিল। একজন বলল, "এরা আগে থেকে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিল। নইলে পাহারা রাখত না।"

ভাল করে দেখে নিয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, "আরও একটা লোক ছিল, সে পালিয়েছে। সে গিয়ে গাঁয়ের লোককে ডেকে আনতে পারে। কয়েকজন নীচে পাহারায় থাক। এতক্ষণ গুলি, বোমা চালানো হয়নি; কিন্তু যদি গাঁয়ের লোক বাঁধা দিতে আসে তা হলে ঝাঁঝরা করে দিবি। আমাদের কাজে একটু সময় লাগবে।"

একটা লোক বলল, "কিন্তু কালু, কিঙ্করকে না পেলে তো জিনিসটার হদিস পাওয়া যাবে না।"

"কিঙ্কর রাজবাড়িতেই আছে, খবর পেয়েছি। রাজবাড়িতে আগে যা বাজার হত এখন তার তিনগুণ হচ্ছে। তার মানে একজন খুব খানেওলা লোক এখানে

লুকিয়ে আছে। কিঙ্কর ছাড়া কে ?”
সবাই চাপাস্বরে বলে উঠল, “ঠিক কথা ”
তুই কত বড় বোকার মতো কাজ করেছিস জানিস ? শঙ্কর পালোয়ানকে মেরেছিলাম বাধ্য হয়ে, সে কিছুতেই কবুল করেনি । তারপর রাগের চোটে কিঙ্করকেও মারতে গিয়েছিলি । কিঙ্কর মরে গেলে ওই সোনার হদিস পাওয়া যেত ? বেঁচে আছে বলে রক্ষে । তাও কথা বের করা যাবে কিনা জানি না । স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে শুনেছি। কিন্তু এখন আর কথা বলার সময় নেই। জনাছয়েক পাহারায় থাক । পাঁচজন আমার সঙ্গে ওপরে আয় । ”
সর্দারের পিছু-পিছু যে পাঁচজন রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছিল, তাদের একজন বলল, “আচ্ছা সদর, স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকলে কিঙ্করের কাছ থেকেই বা সোনার হদিস পাবে কেমন করে ?”
“মারের চোটে মড়াও কথা বলে । তবে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে একপক্ষে ভালই হয়েছে। নইলে হয়তো রাজপুতুরটাকেই সব বলে দিত | ”
“বলেনি তা কী করে জানলে ?”
“আমার আরও চোখ আছে রে । সব খবর পাই । ”
দোতলার ঘরে বীণা বাজাচ্ছে বীরচন্দ্র, মোহিত হয়ে শুনছে কিঙ্কর । হঠাৎ বীণা থামিয়ে বীরচন্দ্র উৎকর্ণ হল, তারপর বীণাটা রেখে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বলল, “কিঙ্কর, লুকোতে হবে । ”
কিঙ্কর একটু যেন অবাক হয়ে বলে, “কেন ?”
“বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে । ”
কিঙ্কর হঠাৎ শক্ত হয়ে মুঠো পাকিয়ে বলল, “সেই লোকটা ? তাকে আমি পিষে ফেলব । ”
বীরচন্দ্র স্নান হেসে বলে, “তার আগে আত্মরক্ষা করা দরকার । আর সময় নেই। এসো। নীচে দরজায় শব্দ পাচ্ছি যেন । ওরা বাইরে থেকেই দরজা খুলতে জানে বোধ হয় । এসো ।”
দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। বীরচন্দ্র ডান দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কিঙ্করকে নিয়ে আর-একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে একতলায় এল। তারপর চোরাকুঠুরির দরজা খুলে নেমে এল পাতাল ঘরে । এখানে ঘুটঘুটি অন্ধকার আর সোঁদা গন্ধ । ইদুরের দৌড়োদৌড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ।
“কিঙ্কর, ভয় করছে না তো ?”
“না।”
“শব্দ কোরো না । ”
চোরাকুঠুরিতে দুখানা তরোয়াল আগে থেকেই রেখে গেছে বীরচন্দ্র । অন্ধকারেই হাতড়ে-হাতড়ে তরোয়াল দুটো খুঁজে নিয়ে একখানা কিঙ্করের হাতে দিয়ে বলল, “এটা রাখো । খুব দরকার না হলে ব্যবহার কোরো না । ”
কিঙ্কর বলল, “আমার তরোয়াল লাগে না, হাতই যথেষ্ট । ”

"আচ্ছা বেশ।" যে ছ'জন রাজবাড়ির ফটকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা হঠাৎ অবাক হয়ে শুনল, একটা লোক চু-কিত-কিত-কিত-কিত করতে-করতে এদিকেই ধেয়ে আসছে। "ওটা কে রে?" "পাগল-ফাগল হবে। একটু আগে হাটখোলার কাছেও দেখেছি।"

"খুব বেআদপ তো।"

"বেআদপটা দৌড়ে এসে পড়ল সামনে। তারপর পট করে সামনের লোকটাকে একটা থাপ্পড় মেরেই পিছু ফিরে আবার চু-কিত-কিত করে ছুটতে লাগল। চড়-খাওয়া লোকটাও পিছু-পিছু ছুটে গিয়ে পটাং করে একটা লাথি কষাল লোকটাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় লোকটা লাথিটা এড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর লোকটাকে তুলে অনায়াসে একটা আছাড় মেরে হাত ঝাড়তে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে বাকি পাঁচজনের মাথায় খুন চেপে গেল। তারা এমনিতেই খুনখারাপ করে বেড়ায়, একটা গেঁয়ো লোকের এহেন স্পধা সহ্য করবে কী করে? "ধর, ধর ব্যাটাকে, লাশ ফেলে দিই।" বলে তারা পাঁচজন মিলে দুঃখবাবুকে তাড়া করল। দুঃখবাবু চু-কিত-কিত-কিত-কিত করতে-করতে ফের ছুটতে লাগলেন। পাঁচজনের একজন খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। দুঃখবাবু তাকে মাজা দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়েই ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন। লোকটা যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন বজ্রাদপি কঠোর একটা গাঁট্টাও বসিয়ে দিলেন মাথায়। গট্টাটা মেরে তাঁর খুবই আনন্দ হল। এতদিনে তিনি ভূতের ঋণ শোধ করছেন।

বাকি চারজন কাণ্ডটা দেখে আর কাণ্ডজ্ঞান রাখতে পারল না। একজন পিস্তল তুলে ফটাস করে গুলি চালিয়ে দিল। দুঃখবাবু মাথাটা সরিয়ে নিয়ে গুলিটা পাশ কাটালেন। তারপর নিচু হয়ে একখানা গুতো মারলেন। লোকটা ছিটকে শূন্যে উঠে গেল। ওই অবস্থাতেই তার পেটে একখানা ঘুসি মারলেন দুঃখবাবু। তারপর ফের চু-কিত-কিত করে দৌড় লাগালেন। তিনি যে এত প্যাঁচ-পয়জার জানেন তা তাঁর নিজেরও এতকাল জানা ছিল না।

বাকি তিনটে লোক হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে মার-মার করে ধেয়ে আসছে। তাদের হাতে ছোরা, বোমা, বন্দুক। একটা লোক একটা বোমা বোধ হয় ছুড়েও মারল। সেটা দুঃখবাবুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে সামনে পড়তেই দুঃখবাবু সেটাকে ফুটবলের মতো একখানা শট করলেন। সেটা ফের উড়ে গিয়ে বোধ হয় রাস্তার ধারে কোনও খানাখন্দে পড়ল। কিন্তু ফাটল না। কিন্তু শটটা মেরে দুঃখহরণের আবার আনন্দ হল। তিনি কি ফুটবলও খেলতে পারেন তা হলে? শটটা তো মন্দ হল না!

তিনজনের একজন বড় গা ঘেঁষে এসে পড়েছে। দুঃখবাবু একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে পট করে হাত বাড়িয়ে একটা রদ্দা কষালেন তার ঘাড়ে। লোকটা কোঁক করে উঠল। দুঃখবাবু তার চুল মুঠো করে ধরে এক হ্যাঁচকায় তাকে হ্যামার থ্রোর ভঙ্গিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন পাশের খন্দে। রইল বাকি দুই।

দুজনের একজনের হাতে ছোরা, অন্যজনের বন্দুক। কিন্তু কেউই অস্ত্র দুটো ব্যবহার করতে পারছে না ছুটতে হচ্ছে বলে। দুঃখবাবু দুজনকে দেখে নিয়ে মহানন্দে নানা রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে ছুটতে লাগলেন। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর দুঃখবাবু টের পেলেন লোক দুটো হেদিয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি এবার সোজা ছুটতে-ছুটতে মাধব ঘোষালের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। পিছু-পিছু হাঁফাতে-হাঁফাতে দুটো লোক।

"ঘোষালমশাই, এনেছি।"

"কাকে এনেছ?"

"এই দেখুন না?"

লোক দুটো এল টলতে-টলতে। এসেই দড়াম-দড়াম করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

দুঃখবাবু একগাল হেসে বললেন, "বড্ড হেদিয়ে পড়েছে।"

লোক দুটো এতই হেদিয়ে পড়েছে যে, হাপরের মতো শব্দ করে হা-হ্যা করে শ্বাস নিচ্ছিল। বন্দুক আর ছোরা হাত থেকে খসে পড়ে আছে সামনে। ভজনলাল তাড়াতাড়ি গোরুর দড়ি এনে দুজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

দুঃখবাবু বললেন, "ঘোষালমশাই, রাজবাড়িতে কিন্তু একটা দল ঢুকে পড়েছে। তাড়াতাড়ি চলুন।"

"রাজবাড়িতে? রাজবাড়িতে কেন? তারা তো রাজুকে খুঁজছে!"

"তা জানি না, তাড়াতাড়ি চলুন।"

মাধব ঘোষাল কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন। তারপরই লাফিয়ে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! আমি তো মস্ত আহাম্মক, রাজু আসলে বোধ হয় রাজকুমার। পুরো কথাটা কিঙ্কর বলতে পারছিল না বলেই বোধ হয় তোতলাচ্ছিল। সর্বনাশ!"

সবাই মিলে রাজবাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পাতালঘরে অন্ধকারে উর্ধ্বমুখ হয়ে বসে ছিল বীরচন্দ্র। পাশে কিঙ্কর। বীরচন্দ্রের হাতে নাঙ্গা তরোয়াল। ওপরে ভারী-ভারী পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। হঠাৎ করে যেন একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

বীরচন্দ্র সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কিঙ্কর, তুমি এখানেই থাকে। নোড়ো না, আমি আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"আমার বনমালী আর রাঁধুনির কথা খেয়াল ছিল না, ওরা বোধ হয় বিপদে পড়েছে।' বলেই বীরচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলায় ছুটতে লাগল।

কিন্তু ওপরের বারান্দায় উঠে আসতেই একেবারে মুখোমুখি কালান্তক যমের মতো একটা লোক। হাতে বন্দুক। বীরচন্দ্রের দিকেই তাক করা।

"তরোয়াল ফেলে দাও। আমরা বন্দুক চালাতে চাই না।"

বীরচন্দ্র বলল, "তোমরা বনমালী আর রাঁধুনিকে কী করেছ? বলো, নইলে শাস্তি পাবে।"

"ইস, রাজগিরি দেখানো হচ্ছে! অ্যাঁ ! রাজগিরি ! শাস্তি দেবে ?"

বীরচন্দ্র আর থাকতে পারল না । লম্বা তরোয়ালটা বোঁ করে চালিয়ে দিল। তরোয়ালের ঘায়ে বন্দুকটা খসে পড়ল লোকটার হাত থেকে ।

বীরচন্দ্র একটা হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যেতেই লোকটা দু কদম পিছিয়ে গেল । কিন্তু সে একা নয় । পেছনে আরও পাঁচ-পাঁচটা গুণ্ডা। বীরচন্দ্র হু-হুঙ্কারে তরোয়াল চালাতে লাগল বটে, লোকগুলো নাগালে এল না । একটা লোক পিস্তল তুলে দুবার গুলি চালিয়ে দিল ।

বীরচন্দ্র জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর ।

সর্দার বলল, "আয় । এই সিঁড়ি দিয়ে ও উঠে এসেছিল । কিঙ্কর নিশ্চয়ই নীচে কোথাও আছে । "

কিঙ্করকে খুঁজে বের করতে খুব বেশি দেরি হল না তাদের । পাতালঘরে নেমে মুখে টর্চের আলো ফেলতেই কিঙ্কর প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল । তারপরই সে হঠাৎ লোকটাকে দেখতে পেল । লম্বা, কালো, ভয়ঙ্কর দুটো চোখ ।

"তুই ! তুই !" বলতে-বলতে কিঙ্কর লাফিয়ে উঠল । দু হাত মুঠো পাকিয়ে বলল,"তোকে… তোকে…"

কিন্তু কিঙ্কর দু পা এগনোর আগেই বন্দুকের কুঁদের ঘা এসে পড়ল কাঁধের হাড়ে । একটা চেন বোঁ করে এসে লাগল তার কপালে । কিঙ্কর বসে পড়ল ।

সর্দার এগিয়ে এসে বলল, "এবার বল তো, সোনা কোথায় আছে । লক্ষ্মীছেলের মতো বলে দে । "

"জানি না । "

"খুব ভালই জানিস । বুড়ো রাজা মরার সময় তোর বাবা তার কাছে ছিল । মরার আগে বিশ্বাসী লোক বলে তাকেই খবরটা দিয়ে যায়। বলেছিল, আমার ছেলে বড় হলে খুব অভাব-কষ্টে পড়বে। তখন তাকে সোনার হদিসটা দিও ! বলেছিল কি না ?"

কিঙ্কর কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "আমি জানি না। মনে নেই। তুই খারাপ লোক । "

সর্দার কিঙ্করের পাঁজরে একটা লাথি মেরে বলল, "বল । নইলে মরবি । "

কিঙ্কর ফের লাফিয়ে উঠে লোকটার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল । কিন্তু চারদিক থেকে বন্দুকের কুঁদো, চেন, মুগুর বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল তার মাথায়, কাঁধে, কপালে, শরীরের প্রায় সর্বত্র । কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল কিঙ্কর ।

"কোথায় ? বল, নইলে."

"জানি না । জানি না । জানি না । রা-রাজু একটা উচু জায়গায় বসে থাকে । "

"ওটা কোনও জবাব নয় । ঠিক করে বল । "

কিঙ্কর মাথা নেড়ে বলে, "জানি না । "

"তোর বাবাকে কেন মেরেছিলাম জানিস ? ঠিক এই অবাধ্যতার জন্যই । যখন তোর সামনেই তাকে গুলি করতে যাই তখনও আমার বিশ্বাস ছিল বাপকে

বাঁচাতে তুই গুপ্ত খবরটা বলে দিবি। তুই বললি না, তোর বাপও মরল। এখনও যদি না বলিস তবে এবার তুই মরবি। মরতে চাস?"

"আমি জানি না। মনে পড়ছে না।"

সর্দার গম্ভীরভাবে বলল, "কেলো, ব্লেড চালা তো।"

কেলোর আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে ব্লেড ধরা। সে চকিতে এগিয়ে গিয়ে কিঙ্করের গালে আর দু হাতে হাতটা একবার বুলিয়ে দিল!

কিঙ্করের মুখ আর হাত থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। আর একজন এগিয়ে গিয়ে একটা থলি থেকে একমুঠো নুন নিয়ে ছুড়ে মারল তার গায়ে।

কিঙ্কর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

"এবার বল কিঙ্কর, নইলে কপালে আরও কষ্ট আছে।"

হঠাৎ দলের একটা লোক সর্দারের কানে-কানে কী একটা বলল। সদর ভূ কোঁচকাল। তারপর মাথা নাড়ল। বন্দুকটা তুলে কিঙ্করের দিকে তাক করে বলল, "এক থেকে তিন গুনব। তার মধ্যে বলা চাই। এক. দুই. তিন.."

তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ ঘরে বন্দুকের একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হল। ওপর থেকে চাপড়া খসে পড়ল। ঘরটা কেঁপে উঠল।

কিঙ্কর একটা অদ্ভুত ওয়াঃ শব্দ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

সর্দার একটু হাসল, "এবার ব্যাটা বলবে। বন্দুককে খুব ভয় খায়।"

বলাই বাহুল্য, গুলি কিঙ্করের গায়ে লাগেনি, সর্দার শুধু ওর কানের পাশ দিয়ে গুলিটা চালিয়ে দিয়েছে।

মিনিট কয়েক বজ্রাহতের মতো পড়ে রইল কিঙ্কর। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ মেলল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ ভাবলার মতো চেয়ে থেকে হঠাৎ সে যেন শিউরে উঠে বলল,"রাজকুমার...বেদি...সোনা...'

সর্দার মোলায়েম গলায় বলল, "বাঃ, এই তো স্মৃতি ফিরে আসছে দেখছি। আস্তে-আস্তে বল।"

কিঙ্কর কিছুক্ষণ সর্দারের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই ধাক্কায় সবাইকে সরিয়ে চোখের পলকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ওপরে। তারপর দৌড়তে-দৌড়তে চিৎকার করতে লাগল, "রাজকুমার! রাজকুমার"

সর্দার আর তার দলবলও উঠে এল ওপরে। বাইরে হাজার লোক তখন রাজবাড়ি প্রায় ঘিরে ফেলেছে। মাধব তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল তারাও সব গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

পুঁটে সর্দার বলল,"ঘোষালমশাই, বন্দুকের সামনে আমাদের সুবিধে হবে না। তবে একটা উপায় আছে। আমার এই লাঠিগাছ একসময়ে অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আজ বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু একবার চেষ্টা করতে পারি।"

বলেই পুঁটে সর্দার একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাঠিটা বনবন করে ঘোরাতে-ঘোরাতে রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। চেঁচাতে লাগল, "খবদার। খবদার ?"

চু-কিত-কিত-কিত করতে-করতে দুঃখবাবুও ঢুকে পড়লেন। একটু পেছনে বন্দুক হাতে বাসব দত্ত। তাঁর পেছনে ভজনলাল।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তরোয়াল হাতে বীরচন্দ্রও নেমে এল। পেছনে কিঙ্কর।

সর্দার আর স্যাঙাতরা পরিস্থিতিটা একটু বুঝে নিয়েই বন্দুক তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘটোৎকচের মতো পেছন থেকে তাদের ওপর এসে পড়ল কিঙ্কর। গোটা দলটা বেসামাল হয়ে যেতেই পটাপট লাঠি পড়তে লাগল। ভজনলাল আর পুঁটে মনের সুখে মারতে লাগল। দুঃখবাবু দুটোকে পেড়ে ফেললেন।

কিঙ্কর সর্দারকে দু হাতে তুলে আলাদা করে নিয়ে এল। তারপর তার গলা টিপে ধরে বলল, "তোর আজই শেষ রাত্রি।"

সদার মরেই যেত। কিন্তু বীরচন্দ্র এসে আটকাল, "কিঙ্কর, তোমাকে আমার দরকার। খুন করে জেলে গেলে তো আমার কাজ হবে না।"

ভজনলাল তাড়াতাড়ি এসে সর্দারকে বেঁধে ফেলল। বাঁধতে সে খুবই পটু। অন্যদের ইতিমধ্যেই বেঁধেছেদে পোটলা-পুটলির মতো সাজিয়ে রেখেছে একধারে।

মাধব এসে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে বললেন, "আরও একটু কাজ আছে। এদের আসল সর্দার ও-লোকটা নয়। আমাদেরই একজন। নইলে কে কোথায় লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে তা ওদের জানার কথা নয়। তা ছাড়া কিঙ্কর যে একটা গুপ্ত খবর জানে তাও বাইরের লোকের অনুমান করা শক্ত। সর্দার, বলো তো লোকটা কে ?"

সর্দার বাঁধা অবস্থায় বলল, "জানি না।"

সঙ্গে-সঙ্গে কিঙ্করের একটা গুতো তার পেটে পড়তেই সে কোঁক করে উঠে বলল, "বলছি ! বলছি!"

ভিড়ের ভেতর থেকে রায়বাবু এগিয়ে এসে বললেন, "কুলাঙ্গার, লাফাঙ্গা ! একটা কোঁতকাও হজম করতে পারিস না ? নাও বাবা ভজনলাল, আমাকেও বেঁধে ফেলো। তবে মারধোর কোরো না। ওসব হুড়যুদ্ধ আমার সহ্য হয় না। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাধববাবু, ঠিকই ধরেছেন। রাজামশাই মারা যাওয়ার সময় আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। শঙ্করকে কিছু একটা বলতে দেখেছি, কিন্তু শুনতে পাইনি। সন্দেহটা তখন থেকে। শঙ্কর তারপর সেই যে হাওয়া হয়ে যায়, অনেকদিন বাদে এই মাসছয়েক আগে তার হদিস করতে পারি। আর আমার কিছু বলার নেই।"

ভজনলাল খুবই রস্নহের সঙ্গে রায়বাবুকেও বেঁধে ফেলল। তারপর বলল, "এখুন এসব মাল কুথায় চালান হোবে ঘোষাল মহারাজ ?"

"ভেবে দেখি। এখন সবাই বাড়ি যাও। রাত হয়েছে।" মাধব দুজনের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করলেন। কিঙ্করের আঘাত গুরুতর। কিন্তু মস্ত মানুষ, মহা

শক্তিমান । কাজেই প্রাণশক্তির জোরেই খাড়া থাকবে । বীরচন্দ্রের বা হাতে দুটি গুলি লেগেছে। কিন্তু সেও সামলে যাবে ।

একটু বাদে দু'জনকে নিয়ে দরবার ঘরে এলেন মাধব । কিঙ্করকে বললেন, "তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে তো "

"যে আজ্ঞে । সিংহাসনের বেদির তলায় সোনা আছে এ-কথা বাবাই আমাকে বলে গিয়েছেন । "

কিঙ্কর গিয়ে শ্বেতপাথরের তৈরি বেদিটার সামনে দাঁড়াল । তারপর নিচু হয়ে বেদির ওপরের স্তরের যে-অংশটার কানা বেরিয়ে আছে সেই অংশটার কানা ধরে সজোরে চাড় দিল । ভারী পাথর চড়চড় করে উঠে এল ।

"দেখুন । "

মাধব এবং বীরচন্দ্র দেখলেন । পাথরের নীচে সোনার স্তর । কিঙ্কর বলল, "গোটা বেদিটাই সোনার । চার থেকে পাঁচ মন সোনা ঢালাই করে তৈরি । ওপরে শ্বেতপাথর দিয়ে ঢাকা ছিল । "

বীরচন্দ্র অবাক হয়ে বলল, "এত সোনা ! এ দিয়ে কী হবে ?"

মাধব হাসলেন, "কেন, তুমিই না বলেছিলে টাকা থাকলে নবীগঞ্জের দুঃখ দূর করতে ! তাই করবে। মানুষের হৃদয়ের রাজা হবে । "

বীরচন্দ্র বলল, "তবে তাই হোক । "

পরদিন ভোরবেলা ভারী সুন্দর করে রোদ উঠল। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। প্রজাপতি উড়ছে । গোরুর হাম্বা শোনা যাচ্ছে । হরিহরের পাঠশালায় ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। পাঁচু পান্তাভাত খেতে বসেছে। হাবু ঘোষ খালে মাছ ধরছে । নিমাই-নিতাই দাঁতন করছে। বাসব দত্ত বন্দুকে তেল লাগাচ্ছে । নয়ন বোস ম্যাজিক প্র্যাকটিস করছে। হরেন চৌধুরী গান গাইছে।

ওদিকে মাধব ডাকাতদের পুলিশের হাতে দিতে রাজি হননি । তাঁর বাড়িতে অনেকে জড়ো হয়েছে । একপাশে হাত-পা বাঁধা ডাকাতরা আর রায়বাবু লজ্জিতভাবে বসা । মাধব বললেন, "জেল খেটে কারও সংশোধন হয় না । আমি ওদের প্রস্তাব দিয়েছি নবীগঞ্জের উন্নতির জন্য বীরচন্দ্র যেসব কাজ করবেন তাতে এরা সবাই কায়িক শ্রম দেবে । পুকুর কাটা, রাস্তাঘাট তৈরি, নতুন স্কুলবাড়ি, হাসপাতাল, অনেক কাজ হাতে । কাজের ভেতর দিয়েই মানুষের সংশোধন হয় । কী হে, তোমরা রাজি তো ! রায়বাবু কী বলেন ?"

সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ।

সরকারমশাই সকালে বাজারে চলছেন। পুঁটে সর্দারের সঙ্গে দেখা ।

"এই যে ষষ্ঠীচরণ, তা খবর কী গো ?"

পুঁটে মাথা নেড়ে বলল, "না-না, বাজার আমার সকালেই হয়ে গেছে । "

বীরচন্দ্র স্থির করেছে, সে আর রাজবাড়িতে থাকবে না । রাজবাড়ি সংস্কার করে একটা কলেজ আর সংগ্রহশালা হবে ।

বীরচন্দ্র এবার থেকে সাধারণ বাড়িতে অন্য পাঁচজনের মতো থাকবে ।

রাত্রেই কথা হয়ে গেছে, কিঙ্কর আর দুঃখহরণ মিলে একটা কুস্তির আখড়া খুলবেন। নবীগঞ্জের ছেলেদের তালিম দেওয়া হবে সেখানে।

হেডসার এসেছেন দুঃখহরণবাবুর কাছে। হাত কচলে বলছেন, "এবারকার মতো দোষঘাট মাফ করে দিন দুঃখবাবু। আমাদের সকলের ইচ্ছে গেম-টিচারের পোস্টটা আপনিই নিন, তা হলে খেলাধুলোয় স্কুলের খুব নাম হবে।

দুঃখবাবু বললেন, "পরে ভেবে দেখব। আগে সামনের ওলিম্পিক থেকে কুস্তি আর ম্যারাথনের সোনার মেডেল দুটো নিয়ে আসি।"

দুঃখবাবুর দুই বাঁদর ছেলে সকালে এসে খুব ভয়ে-ভয়ে বাবাকে প্রণাম করে গিয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো পড়তে বসেছে। চণ্ডিকাদেবী একগলা ঘোমটা টেনে গরম লুচিভর্তি থালা নিয়ে এসেছেন। দুঃখবাবুর আর তেমন দুঃখ নেই।